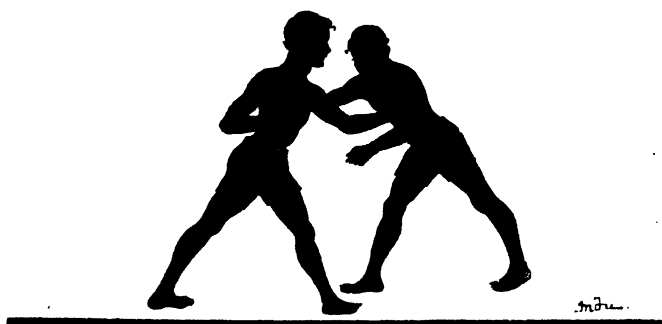
ব্যায়ামে বাঙালী



শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্. এ.-প্রণীত

বীরত্বে বাঙালী	১৲
ব্যায়ামে বাঙালী	১৲
বিজ্ঞানে বাঙালী	১৸০
বাংলার ঋষি	১৷০
বাংলার মনীষী	১৲
বাংলার বিদুষী	১৲
রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা	৸০
আচার্য জগদীশ—জীবনী ও আবিষ্কার	১৲
বৈজ্ঞানিক জগদীশ	৸০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী	৸০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বক্তৃতা	৸০
মহাকবি ইকবাল	৷৵০
কেনারাম	৷০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

৬৪ কলেজ স্ট্রিট্, কলিকাতা ও ঢাকা

ব্যায়ামে বাঙালী

'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'

'বীরত্বে বাঙালী', 'বিজ্ঞানে বাঙালী', 'বাংলার ঋষি', 'বাংলার মনীষী',
'বাংলার বিদুষী', 'কেনারাম', প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ—পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
৬৯ কলেজ স্ট্রীট : কলিকাতা
বাংলাবাজার : ঢাকা

এক টাকা

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে শ্রীবিভাবতী গুহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ভারত আর্ট প্রেসে (ঢাকা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা

শরীর-চর্চ্চা জাতীয় শিক্ষার একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সকল দেশেই বালক ও যুবকগণের ব্যায়ামাদি শিক্ষার সুসঙ্গত বিধি-ব্যবস্থা আছে এবং এই উদ্দেশ্যে নানারূপ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানাদির উদ্ভব হইয়াছে। সেদিন ইংলণ্ডের 'জাতীয় ক্রীড়াভূমি সমিতি' তরুণদিগের জন্য একটী খেলার মাঠ সংগ্রহার্থ সাধারণের নিকট দেড় কোটী টাকার জন্য আবেদন করিয়াছেন। জার্ম্মানীতে জিলায় জিলায় 'ক্রীড়া পরামর্শ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত আছে। 'ক্রীড়াই জাতীয় ব্যাধি অপসরণের মহৌষধ'—ইহাই হইয়াছে নব্য জার্ম্মানীর মূলমন্ত্র। কেবল আমাদের দেশেই এ সম্বন্ধে সংহত ভাবে কোন প্রচেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সুশিক্ষার এই প্রয়োজনীয় অঙ্গটি অবহেলা করিয়া বাঙালী আজ কত না অপমান-অত্যাচার মাথা পাতিয়া সহ্য করিতেছে। আমরা যে সমাজে বাস করি, তাহাতে ধন-প্রাণ মান-মর্য্যাদা লইয়া থাকিতে হইলে প্রত্যেকেরই আত্মরক্ষায় সক্ষম হওয়া প্রয়োজন।

দেশে সংহত ভাবে শরীর-চর্চ্চা প্রচলিত না হইলেও আমাদের মধ্যে শক্তিসাধক কৃতী পুরুষের অভাব নাই। তাঁহারা আমাদেরই মত ডাল-ভাতে পরিপুষ্ট এবং একই জলবায়ুতে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়া জগতের শক্তিমানের বৈঠকে কীর্ত্তিধ্বজা তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই সমস্ত আদর্শ চরিতগুলি সম্মুখে রাখিয়াই আমাদিগকে শরীর-সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। এজন্য তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও

জীবনের সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্য লইয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির জন্ম।

পত্রিকাদিতে নানা প্রবন্ধে কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যায়াম-বীরের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ইহার পূর্ব্বে সামান্যই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থাকারে এবং ধারাবাহিক ভাবে বাঙালার ব্যায়াম-বীরদের জীবনী ইহাই প্রথম। ভরসা আছে, জাতির এত বড় দুর্দ্দিনে বাঙালী ইহা উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

গ্রন্থশেষে সরল ব্যায়াম-প্রণালীর একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের ব্যায়াম চর্চ্চার কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা নাই, তাহারা এই প্রণালীতে ব্যায়ামাদি করিতে পারিবেন।

পরিশেষে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে যাহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত গোবরবাবু, শ্রীযুক্ত ফণীবাবু, স্বর্গীয় মহেন্দ্রবাবু, শ্রীযুত রাজেনবাবু, শ্রীযুত ননীবাবু তাঁহাদের জীবন-কথা জানাইয়া আমাকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত সূর্য্যবাবু, তাঁহার ভ্রাতা ৺শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। ৺শ্যামাকান্ত বাবুর জীবনীর জন্য আমি শ্রীযুত বিষাদভূষণ দাসগুপ্ত এম-এ মহাশয়ের নিকট বিশেষ ঋণী। সুভাঢ্যাগ্রাম-নিবাসী ৺পরেশনাথের সম্বন্ধী শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বি-এল্ মহোদয় ৺পরেশবাবুর জীবনী বলিয়া দিয়া অশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অনেক পুস্তক-পত্রিকাদি হইতে এবং আরো অনেকের নিকট বহু সাহায্য পাইয়াছি। সে জন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পরিশেষে আমার যে সমস্ত অকৃত্রিম বন্ধু এই পুস্তকের জন্য নিজেদের সময় ও কাজ নষ্ট করিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং উৎসাহ

দিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমার পরম কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ ইহাদেরই চেষ্টা ও শ্রমে এই গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

এই গ্রন্থের লভ্যাংশের কিয়দংশ কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে শরীর-চর্চ্চার উন্নতিতে ব্যয়িত হইবে।

অনেক দোষ-ত্রুটি এই বইতে অবশ্যই আছে। আমি যে-কয়টি জীবনী লিখিয়াছি, তাহাদের দ্বারাই বাঙ্‌লাদেশের ব্যায়াম-বীরগণ নিঃশেষিত হন না। ইঁহারা ব্যতীত বাঙ্‌লাদেশে জীবিত ও মৃত, হিন্দু ও মুসলমান, আরো অনেক ব্যায়াম-বীর আছেন। তাঁহাদের জীবনী যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানাইলে সাগ্রহে ও সানন্দে গ্রহণ করিব ও পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রকাশ করিব।

শ্রীমন্ মহাবীর কুস্তিগীরদিগের ইষ্ট দেবতা। তাঁহারই বীর্য্যপ্রদ পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া বাঙালী-জীবনে তাঁহার মঙ্গল আশিস্ মাগিতেছি। অয়ং আরম্ভঃ শুভায় ভবতু।

নিবেদক

বর্ষা, ১৩৩৪ সাল

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ব্যায়ামে বাঙালী' এত শীঘ্র আবার ছাপিতে হইতেছে দেখিয়া মনে হয়, বুঝি বাঙালীর সুমতি ফিরিয়াছে। বাঙালীর জীবন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে ভরপূর হউক, হৃদয়ে এই আশা লইয়াই বইখানা লিখিয়াছিলাম। আজ আমার আনন্দ এই, দেশের গুটিকয়েক ছেলেও শরীর সাধনায় প্রকৃত সাধকের মত আত্মনিবেশ করিয়াছেন। বাঙালীর শরীর-সাধনায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যদি কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পারে, তাহাতেই আমার শ্রমের চরম সার্থকতা।

এই সংস্করণে বই খানায় কিছু কিছু নূতন বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। 'তরুণ বাঙ্লার শারীর-সম্পদ' বাঙ্লার তরুণ-জীবনে আশা ও উৎসাহ দিতে পারিবে, আশা করি।

চৈত্র
১৩৩৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

চতুর্থ সংস্করণ

'ব্যায়ামে বাঙালী'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হল। দেশবাসীর সহৃদয় সহানুভূতি আমার এই প্রয়াসের ইন্ধন যুগিয়েছে। বাঙালী ছেলে-মেয়েরা ব্যায়াম-চর্চা ক'রে বলিষ্ঠ দেহ ও কর্মিষ্ঠ জীবন লাভ করে, এই উদ্দেশ্যেই বইখানি লিখেছিলাম। আজকের সংকটময় দিনে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হবে, নইলে বাঁচবার উপায় নেই। আমার এ বইখানি সংগ্রামশীল জীবনের সাথী হোক্, এই কামনা।

এ সংস্করণে বইখানিকে নানাদিক্ দিয়ে সমৃদ্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৩৯
কলিকাতা
৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

সূচীপত্র



শ্যামাকান্ত সন্ন্যাসাশ্রমে (সোঽহং স্বামী)

শ্যামাকান্ত

বাঙ্‌লা দেশের শিক্ষিত ও তরুণ দলে যে দুই কৃতী পুরুষ শরীর-চর্চ্চা ও সাহসিকতার প্রথম প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের একজন স্বনামখ্যাত মল্লবীর শ্যামাকান্ত, আর একজন তাঁহারই সুহৃদ্ ও সহযোগী পরেশনাথ। ইঁহাদের পূর্ব্বে বাঙালীর শতমুখী প্রতিভার এই দিক্‌টা দেশের তরুণদের কাছে রুদ্ধ ছিল। শিক্ষিত সমাজে উহার বড় একটা আদর ছিল না। শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথের সাধনা ও তপস্যা তরুণ বাঙ্‌লার প্রাণে একটা নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিল, নব উৎসাহের দীপ্ত প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া ধরিল। আত্মবিস্মৃত জাতির হৃদয়ে অতীতের গৌরব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বাঙালী বুঝিল, জগতের বীর-সভায় তাহার আসনখানা কারো চেয়ে একটুও ন্যূন বা নীচু নয়।

সে বড় বেশী দিনের কথা নয়। সিপাহী-বিপ্লব শেষ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী ১৮৫৮ সাল, বাঙ্‌লা ১২৬৫ সন। এই বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামাকান্তের বাড়ী ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আড়িয়ল গ্রামে। ইঁহারা ফুলিয়া মেলের বন্দ্যঘটী বংশীয়। বিক্রমপুর সমাজে অতি উচ্চ কুলীন বিষ্ণু ঠাকুরের পালটি বলিয়া এই বংশটার বিশেষ খ্যাতি আছে।

শ্যামাকান্তের বাবার নাম ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ত্রিপুরা আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। শ্যামাকান্তেরা চারি ভাই, ইনিই জ্যেষ্ঠ। তাঁহার সব কয়টি ভাই-ই বলবান্ ও সুস্থ-সবল। তাঁহার বোন তিনটি। তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা বাবু সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকার উকীল ছিলেন।

শ্যামাকান্ত ছোটকাল হইতেই স্বভাবতঃ বেশ সুস্থ-সবল ছিলেন। তার উপর, ব্যায়াম-চর্চ্চার ঝোঁক্‌টা তাঁহার চিরদিনই ছিল। তিনি যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে (বর্ত্তমান কলেজিয়েট স্কুল ও ঢাকা কলেজ তখন এক সঙ্গে ছিল) ভর্ত্তি হইলেন, তখন পূর্ণোদ্যমে ও অসীম উৎসাহের সহিত ঢাকা কলেজের বিশাল জিম্‌নাসিয়ামে নানারকম ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতেন এবং কিছুকাল বাবার কর্ম্মস্থল মুরাদনগরে সেখানকার স্কুলেও পড়েন। লেখাপড়ার চেয়ে ডন-কস্‌রতের দিকেই যেন তাঁহার নজরটা বেশী পড়িল।

দুর্ব্বল বাঙালীর কঙ্কালময় ম্লান ছায়াটি তাঁর চোখের সামনে সব সময়েই ভাসিতে থাকিত ; সে দৃশ্য দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিলেন -- জগতের বীরের সভায় বাঙালীর নাম ও মান রাখিবেন।

কলেজিয়েট স্কুলে পড়িবার সময়েই বিখ্যাত মল্লবীর পরেশ-নাথের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা হয়। উভয়ে মিলিয়া লক্ষ্মী বাজারের অধর ঘোষের নিকট তাঁহারই আখড়ায় পূর্ণোৎসাহে কুস্তি-চর্চ্চা করিতে থাকেন। আখড়ার লাল মাটিতে দুইটী বন্ধুকে এমন অভিন্ন সূত্রে গাঁথিয়া তুলিয়াছিল যে একজনের নাম করিলে লোকে আজিও উভয়ের কথা স্মরণ করিয়া চোখের জল ফেলে। ঢাকা অঞ্চলের পালোয়ানেরা লাল টক্‌টকে মাটিতে কুস্তি লড়িয়া থাকেন, কলিকাতার মত গঙ্গার কালো মাটি এখানে নাই। শ্যামাকান্ত যখন সেই লাল মাটিতে কুস্তি লড়িয়া মাটি-মাখা শরীরখানা লইয়া উঠিতেন, তখন সেই বিশাল শুভ্র গৌরবর্ণ দেহটি দেখিয়া মনে হইত, তেজ ও বীর্য্য যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। শুনা যায়, শ্যামাকান্তের 'পুট্টি' প্যাঁচটি নাকি খুব সাফাই ছিল। যাহাকে-তাহাকে পুট্টি মারিয়া কাবু করিয়া দিতে পারিতেন। তিনি এই সময় অনেক পেশাদার পাঞ্জাবী পালোয়ানকে কুস্তিতে চিৎ করিয়া হারাইয়া দিয়াছেন।

শ্যামাকান্ত পরিমিত ও স্বল্পাহারী ছিলেন। তবে, কুস্তি-চর্চ্চার সময় তাঁহাদের ওস্তাদ অধর ঘোষ নাকি আধ মণ

দুধের মালাই তাঁহাকে ও পরেশনাথকে খাওয়াইতেন। সে সময়ে অধর ঘোষের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল।

পাঠ্যাবস্থায়ই তাঁহার সৈনিক হওয়ার খুব সখ হয়। তখন যৌবনের প্রথম উন্মেষমাত্র। জীবনটা তখনও স্বপ্নরাজ্যে। এখনকার ছেলেদের যেমন ইচ্ছা হয়, একজন সৈনিক হইয়া নেপোলিয়ান বা গ্যারিবল্ডীর মত নাম করা, শ্যামাকান্তেরও মনে তখন সে কল্পনা জাগিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সেনা হওয়া বা যুদ্ধবিদ্যা শিখার সখটা বাঙালীর পক্ষে একটা বে-আইনী বে-আদবী। কি করেন, ইংরেজ সরকার তো তাঁহাকে সেনা-বিভাগে ঢুকিতে দিবেন না। কাজেই শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথ দুই বন্ধুতে মিলিয়া জটলা করিলেন। পরামর্শ হইল, কোন দেশীয় রাজ্যে যাইয়া সৈনিক বিভাগে ঢুকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিবেন। একদিন দুই বন্ধু বাড়ী ছাড়িয়া পশ্চিমে রওনা হইলেন। গোয়ালিয়র প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত সৈনিক বিভাগে যে ঘৃণিত দাসত্ব-পরায়ণতা ও দুর্নীতি দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহাদের সেনা হইবার সাধ মিটিল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিলে শ্যামাকান্ত বিবাহ করেন। বিবাহের কয়েকমাস পর শ্যামাকান্ত একবার আগড়তলা বেড়াইতে যান। আগড়তলা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তখন ত্রিপুরার রাজা।

শ্যামাকান্তের শারীরিক শক্তি ও ব্যায়াম-পটুতার কথা তিনি আগেই শুনিয়াছিলেন। এখন, তাঁহার ব্যায়াম-কৌশল ও দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর দেখিয়া তাঁহাকে নিজের পার্শ্বচর নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। শ্যামাকান্ত পিতার নিকট লিখিলেন। তারপর, পিতার অনুমতি পাইয়া মহারাজের সহচর নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ শ্যামাকান্তকে তখন হইতেই খুব স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার যখন যাহা-কিছু দরকার হইত তখনি তাহা দিতেন। শ্যামাকান্ত দুই বছর মহারাজের কাছে থাকেন। তারপর কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় সে কাজ ছাড়িয়া দিলেন। ত্রিপুরা ছাড়িলেও ত্রিপুরা-রাজ তাঁহাকে ভুলেন নাই। শ্যামাকান্ত যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মহারাজের অনুগ্রহ ও অনুরাগ হইতে কখনও বঞ্চিত হন নাই। পরবর্ত্তী কালে যখনই তিনি তাঁহার সার্কাস লইয়া আগড়তলা গিয়াছেন, সব সময়েই মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে সমাদর করিয়া নিতেন এবং পুরস্কৃত করিয়া সম্মানিত করিতেন।

আগড়তলা ছাড়িয়া শ্যামাকান্ত বরিশাল জিলা স্কুলে আসিয়া ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ই তিনি একটি সার্কাসের দল গড়িতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহাকে এ কাজ করিতে নিষেধ করেন। সকলেই বলিলেন, এ কাজে বিপদের সম্ভাবনা ও জীবনের আশঙ্কা খুব বেশী। কিন্তু স্বাধীন-চেতা শ্যামাকান্ত মরণ-বাঁচনকে বড় বেশী

একটা গ্রাহ্য করিতেন না। তাই, আঠার বছরের যুবক এমনতর কাজে লাগিতে পারিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জে তিনি একটা চিতা বাঘ ক্রয় করিলেন। এইটিই তাঁহার প্রথম বাঘ। আফিং বা কোন মাদক দ্রব্যের দ্বারা অনেকে বাঘ বশ করিয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ ডনগীর স্যাণ্ডো একবার এক সিংহের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। সে সিংহটার থাবা, মুখ প্রভৃতি মারাত্মক অঙ্গগুলি চামড়া দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং নখ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শ্যামাকান্ত ও-সব ভড়ং-কায়দার ধার ধারিতেন না। তিনি সোজা খাঁচার ভিতর ঢুকিতেন, তারপর জোর-জবরদস্তি করিয়া রীতিমত লড়াই জুড়িয়া দিতেন। এমন করিয়া দুই মাস মধ্যেই সেই বাঘটাকে বশ করিয়া সেই সুনামগঞ্জেই উহার সহিত খেলা জুড়িয়া দিলেন। বাঘের খেলায় এই তাঁর প্রথম চেষ্টা, এবং সে চেষ্টা সফল হইল। এই বাঘটা বশ করিতে তাঁহাকে অনেকবার নখ ও দন্তাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইয়াছে। ধীরে ধীরে তাঁহার সাহস ও মনের জোর বাড়িল, অভিজ্ঞতা জন্মিল। এখন তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ বন্য ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি যে কোন হিংস্র জন্তু বশ করিতে পারিতেন। হাসিতে হাসিতে পিঞ্জরমধ্যে ঢুকিয়া এই সকল হিংস্র জন্তুর সহিত রোমাঞ্চকর খেলা করিতেন। শ্যামাকান্তের চোখের তীব্র চাহনিতে বাঘ যেন আপনি নিস্তেজ হইয়া পড়িত। এখন হইতে

দেশময় শ্যামাকান্তের নাম পড়িয়া গেল। এই সময়ে ভাওয়ালের জয়দেবপুরের রাজা একটি সুন্দরবনের "রয়েল বেঙ্গল" বাঘ ধরিয়া আনেন। ঐ বাঘটী তিনি শ্যামাকান্তের শক্তি ও সাহসের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

শ্যামাকান্তের হাত দুইটিতে অসাধারণ বল ছিল এবং মনে অমানুষিক জোর ছিল। তাই তিনি হিংস্র বাঘের সঙ্গে এমন নির্ভীক ভাবে লড়িতে পারিতেন। বাঘের থাবায় কত জোর রাখে, একটি গল্প বলি। ভাওয়াল-রাজ যে বাঘটা উপহার দিয়াছিলেন, সেই বাঘটা শ্যামাকান্ত ট্রেনে চাপাইয়া ঢাকা লইয়া আসিলেন এবং পরেশনাথের আখড়ায় উহাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। এই বাঘটার নাম ছিল গোপাল। বাঘটার নিকটেই পরেশনাথ বসিয়া আছেন এবং বাঘের শরীরে কি রকম জোর থাকিতে পারে সেই সব কথাবার্ত্তা চলিতেছে। পরেশনাথ বাঘের সহিত কোনদিন খেলাও করেন নাই, বাঘের শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার কোন ধারণা ছিল না। কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বাঘটা হঠাৎ উঠিয়া পরেশনাথকে এমন একটা চাপড় মারিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেলেন। বাঘের একটি থাবায় কেমন জোর! চারিমণ ওজনের মানুষটি এক চাপড়েই একেবারে কাৎ!

শ্যামাকান্ত তাঁহার সমস্ত হাতখানি জ্যান্ত বাঘের মুখে ঢুকাইয়া দিতেন। বাঘটা দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি নখর হাতে এমন

বিঁধাইয়া দিত যে টস্ টস্ করিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িত। কিন্তু তিনি উহা ধীর ভাবে সহ্য করতেন, বাঘকেও বুঝিতে দিতেন না যে সে কামড় দিয়াছে। ইহা দেখিয়া একবার কাশীতে এক সাহেব-সৈনিক বলিয়াছিলেন—আমি একজন সৈনিক, মরণকে কোন দিন ভয় করি না। কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত মেডেল আমাকে দিলেও আমি এমন বিপজ্জনক কাজ করিতে রাজী নই।

একবার শ্যামাকান্ত বাঘের খেলা দেখাইতে গৌরীপুর যান। সে বাঘটার নাম ছিল রাজা এবং বাঘটাও খুব দুর্দ্দান্ত ছিল। এ বাঘটাও ভাওয়াল-রাজের প্রদত্ত। শ্যামাকান্ত সাধারণতঃ এক দরজাওয়ালা খাঁচার ভিতর বাঘের সঙ্গে খেলিতেন। এ খাঁচায় খেলাটা একটু বিপজ্জনক। শ্যামাকান্ত খেলা শেষ করিয়া যেই পশ্চাতে হঠিয়া বাহিরে এক পা বাড়াইয়াছেন, অমনি বাঘটা তাঁহার মুখে এক থাবা মারিয়াছে। তিনি দেখিলেন, বড়ই বিপদ্। যদি তিনি বাহির হইয়া আসেন তবে বাঘও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিবে। কারণ, খেলা শেষ হওয়ার সঙ্কেত শুনিয়াও বাঘটাকে শিকল দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয় নাই। অথচ বাহিরে এত লোক—বাঘ ছুটিলে আর রক্ষা নাই। তিনি তখন আবার ধীর ভাবে খাঁচায় ঢুকিলেন এবং উপর হইতে শিকল ফেলিয়া বাঘটাকে বাঁধিতে ইঙ্গিত করিলেন। তারপর, শিকল পড়িবামাত্র

এক ধাক্কা দিয়া বাঘটাকে ফেলিয়া দিয়া খাঁচার বাহির হইয়া আসেন।

চুঁচুড়ায় একবার এমনতর একটি ঘটনা হয়। সেবার শ্যামাকান্ত বাঘের মুখে মাংসের টুকরা ফেলিয়া শান্ত ভাবে মাথা বাঁচাইয়া সরিয়া পড়েন।

এমন ধীর ও শান্ত ভাবে অসীম সাহসিকতার পরিচয় মনের উপর কত বড় আধিপত্য জন্মিলে সম্ভবপর হয়, ভাবিবার বিষয়। শ্যামাকান্তের মন তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মবশে ছিল।

একবার পাটনার নবাব একটা প্রকাণ্ড বাঘিনী ধরেন। শ্যামাকান্তকে এই বাঘিনাটার সহিত কুস্তি লড়িতে আহ্বান করা হয়—পুরস্কার দু হাজার টাকা। এমন একটা বন্য হিংস্র জন্তুর সহিত মানুষ লড়িতে পারে ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না। দেশময় এ সংবাদ রটিয়া গেল,—কাগজে কাগজে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। শহর ভাঙ্গিয়া লোক দলে দলে খেলা দেখিতে ছুটিল। মনে হইল, আবার বুঝি রোমের বিলাসী নরনারীর সাধের সেই গ্ল্যাডিয়েটারদের খেলা ফিরিয়া আসিল। এই উৎকণ্ঠিত বিশাল জনসঙ্ঘের সম্মুখে বাঙলার তেজীয়ান্ যুবক বীর শ্যামাকান্ত তাঁহার শুভ্র বিরাট দেহখানি লইয়া যখন আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন চারিদিকে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল, সেই বিশাল জনসঙ্ঘ কোলাহলে মুখরিত হইল—তারপর সব নীরব নিস্তব্ধ! সকলের মুখে-চোখেই উদ্বেগের ভাব, কি যেন



শ্যামাকান্ত (যৌবনে

কি হয়। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সেই বন্য বাঘিনীটাকে মেষ-শাবকের মত পদদলিত করিয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে যখন তরুণ বীর শ্যামাকান্ত গর্ব্বিত বক্ষে দাঁড়াইয়া উঠিয়া জয়োন্নত মস্তকে অভিনন্দন জানাইলেন—অমনি আবার হাজার কণ্ঠে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। নবাব বাহাদুর নগদ ৫ হাজার টাকা, দুইটি আরব দেশীয় ঘোড়া এবং সেই সদ্যোধৃত বাঘিনীটা শ্যামাকান্তকে দান করিলেন। এই বাঘিনীটার নাম ছিল বেগম।

১৮৯৪ সালে শ্যামাকান্ত মাসিক ১৫০০৲ শত টাকা বেতনে ফ্রেড্‌কুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাইবার জন্য নিযুক্ত হন। সে সময় ঐ সার্কাসওয়ালাদের মধ্যে তিনি শারীরিক শক্তি ও সাহসে সকলের চেয়ে বড় ছিলেন। এক বৎসর কাজ করিবার পর তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দেন। উহার পর তিনি তাঁহার নিজের সার্কাস দল লইয়াই নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ান। ক্রমে তিনি রামগোপালপুর, কুচবিহার, ঢাকা, কলিকাতা, পাটনা, রংপুর, আগড়তলা প্রভৃতি স্থানে খেলা দেখান। একবার কিছুদিন তিনি রংপুর অবস্থান করেন। সেখানে এক তেতালা বাড়ীর নীচে তাঁহার পশুশালা ছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ঐ বাড়ী পড়িয়া যায়। তাহাতে ঘোড়া, বানর, কুকুর, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তু ও সার্কাসের সমুদায় আসবাব-পত্র নষ্ট হইয়া যায়। দুইটী বাঘ বাহিরে ছিল বলিয়া বাঁচিয়া

যায়। এই বাঘ দুইটা লইয়া বছর খানেক কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাঘে কুকুরে খেলা, বাঘের সহিত কুস্তি এবং অন্যান্য খেলা দেখান। পরে "Grand Show of Wild Animals" নাম দিয়া একটা বড় ও নূতন রকমের খেলা আরম্ভ করেন। ইহাতে হাতী, কতকগুলি বাঘ, বানর ও কুকুরের খেলা ছিল। ইহাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের শেষ খেলা।

শ্যামাকান্তের খেলার মধ্যে বুকে পাথর ভাঙ্গা ছিল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমাদের দেশে শ্যামাকান্তই সর্ব্বপ্রথম এই খেলা দেখাইয়া বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেন।

বুকের উপর পাথর ভাঙ্গার কসরতে তাঁর সবচেয়ে বেশী নাম হয়। "ঘাড়ের নীচে একখানা চেয়ার, আর পা দুটার নীচে আর একখানা চেয়ার রাখিয়া তিনি দেহটাকে ঠিক একটা সাঁকোর মত করিয়া রাখিতেন, আর তাহার উপরে ১২।১৪ মণ পাথর চাপাইয়া দেওয়া হইত। তারপর, যে কেহ এক প্রকাণ্ড লোহার হাতুরি দিয়া সেই পাথরের উপর ঘা মারিতে থাকিত।" ঘা খাইয়া পাথর ভাঙিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত, কিন্তু সে পাষাণ বক্ষ টলিত না। শ্যামাকান্ত সাধারণতঃ ৮ হইতে ১২ মণ পর্য্যন্ত ওজনের পাথরই ব্যবহার করিতেন; কিন্তু ছোট লাটের বাড়ীতে একবার খেলা দেখাইবার সময় ১৪ মণ ওজনের পাথর বুকে লইয়াছিলেন। কয়েকজন জবরদস্ত গোরা সেনা

বক্ষস্থিত প্রস্তর-খণ্ডের উপর প্রকাণ্ড মুগুরের ভীষণ আঘাত করিয়াও তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

শ্যামাকান্ত আর একটি বড় আশ্চর্য্য খেলা খেলিতেন। শূন্যে পা-দুটা হুকে সংলগ্ন করিয়া তিনি সমস্ত শরীর নীচে ঝুলাইয়া দিতেন। তারপর মাটি হইতে চারি জন বলিষ্ঠ লোককে উপরে তুলিয়া উঠাইতেন।

একবার এল্‌মো (Elmo) নামে মস্ত জোয়ান এক পালোয়ান আসেন। কলিকাতা গড়ের মাঠে এল্‌মোর সহিত তাঁহার মুষ্টি-যুদ্ধ (Boxing) হয়। তিন মিনিট খেলার পর শ্যামাকান্ত তাহাকে এমন এক আছাড় মারিয়াছিলেন যে ১৫ মিনিট তাহার চৈতন্যই হয় নাই। বাঙালীর মান-সম্ভ্রম এমন ভাবে ধরিয়া তুলিতে পারায় সেই বিশাল জনসঙ্ঘের বাঙালী-কণ্ঠে শ্যামাকান্তের জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। কিন্তু মেম-সাহেবেরা ত চটিয়া লাল! তাহারা চেঁচাইয়া উঠিলেন, “That's illegal.” ওটা অন্যায়, বিধি-বিরুদ্ধ। শ্যামাকান্ত গর্ব্বিতকণ্ঠে জবাব দিলেন, “He can stand the shock of being thrown away. But from the standpoint of a boxer, I purposely avoided the calumny of being a murderer.”—ফেলে দেয়েছি, সে ধাক্কাটা উনি সহ্য করতে পারবেন বলেই, পাছে নর-ঘাতক হই এই অখ্যাতিটা এড়াবার জন্যই বেশী চোট দি নাই, সেটা মুষ্টি-যুদ্ধের নিয়ম নয়।

একদিন ঢাকায় স্বর্গীয় পরেশনাথ ঘোষ, বসন্তদেব চৌধুরী প্রভৃতি বন্ধুদিগের সম্মুখে শ্যামাকান্ত ১৪ মণ ওজনের একটা কামানের ন্যায় বিপুলাকৃতি লৌহ-খণ্ডকে মাথার উপর তুলিয়া উহা কয়েক বার ভাজিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

শ্যামাকান্তের মুষ্টিতে এত জোর ছিল যে দেয়ালের গায়ে ঘুসি দিলে চূণ সুরকী ও ইটের গুঁড়া ঝুর ঝুর করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত।

একবার পশ্চিম অঞ্চলে এক ট্রেনে এক বাঙালী মুন্সেফ বাবু তাঁহার ভার্য্যাসহ যাইতেছিলেন। দিনাপুর ষ্টেশনের নিকট তিনজন গোরা এই ভদ্র-মহিলার অবমাননার চেষ্টা করে। এমন সময় শ্যামাকান্ত যমের মত আসিয়া এই তিনটা গোরাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি একক তিনজনের সঙ্গে সমানে ঘুষি চালাইলেন। শ্যামাকান্তের বজ্র মুষ্টির আস্বাদ পাইয়া তিনটি দৈত্য তিনদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। মুন্সেফ-পত্নীর মর্য্যাদা রক্ষা পাইল।

ছোটকাল হইতেই শ্যামাকান্ত ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। ধর্ম্মের বীজ বাল্যেই তাঁহার জীবনে উপ্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরা জেলায় ল্যাংটা বাবা বা পাগলা বাবা নামে এক প্রাচীন সন্ন্যাসী ছিলেন। ইঁহার ব্যবহার বা কথাবার্ত্তায় কেহ কোনদিন বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, ইনি কোন্ জাতীয় বা কোন ধর্ম্মীয়। এই মহাত্মার সহিত শ্যামাকান্তের বাবার সাক্ষাৎ হয় এবং সেই

উপলক্ষে শ্যামাকান্তও ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের সূত্রপাত।

১৮৯৯ সালে শ্যামাকান্তের বাবা মারা যান। ইহার পরই তিনি বাড়ী ছাড়িয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার বয়স ৪২ বছর, স্ত্রী ও কন্যা বর্ত্তমান। গৃহত্যাগ করিয়া তিনি কাশী, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার প্রভৃতি নানা তীর্থস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তিনি যখন কাশী ছিলেন তখন সেখানে এক বৃদ্ধ বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইঁহার আদি নাম নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাড়ী শ্রীহট্ট জেলায়। ইনি ষোল বছরের সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া তিব্বত, চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ এবং সমস্ত ভারতবর্ষে ঘুরিয়া বেড়ান। ইনি ৩২ বছর তিব্বতে ছিলেন বলিয়া সাধারণের নিকট তিব্বতী বাবা বলিয়াই বিখ্যাত। ইঁহারই নিকট শ্যামাকান্ত দীক্ষিত হন এবং ইনি সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে শ্যামাকান্তকে "সোঽহংস্বামী" এই নাম দেন। সেই হইতে সন্ন্যাসী শ্যামাকান্ত সোঽহংস্বামী বলিয়াই পরিচিত।

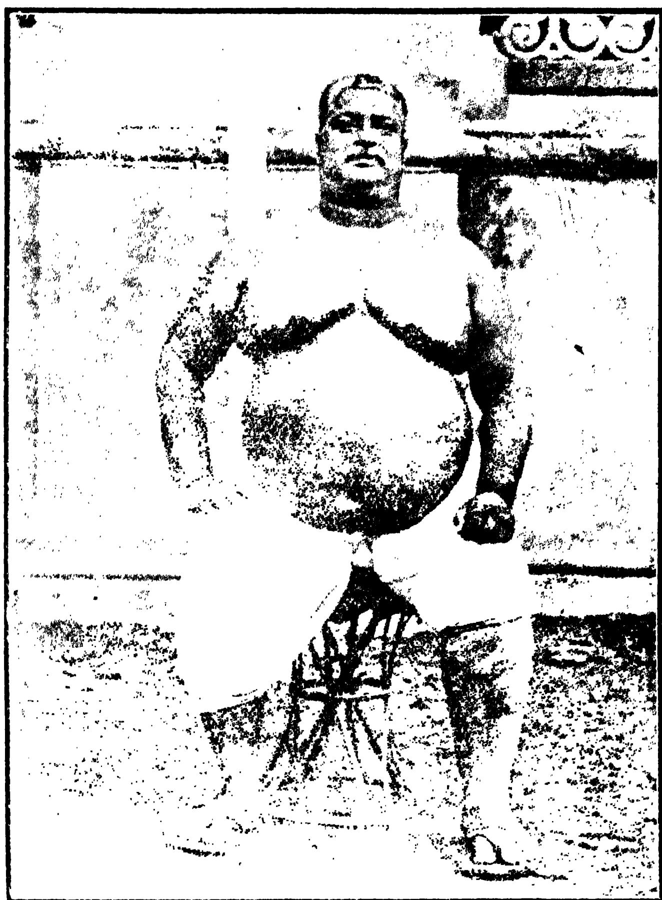
ইহার পর হইতে সোঽহংস্বামী নাইনিতালের সাত মাইল দূরবর্ত্তী হিমালয়ের কোলে ভাওয়ালী নামক স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতেন। আশ্রমটী শশ্মানভূমির নিকটবর্ত্তী, পাশে কল কল স্বরে নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছে—প্রকৃতির শোভাসম্পদে চারিদিক্ ঘেরা।

এই আশ্রমে বাস করিবার সময় একদিন শ্যামাকান্ত বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখেন, দূরে কতকগুলি পাহাড়ী লোক হল্লা করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটা গোরা ছোরা লইয়া উহাদিগকে মারিতে উঠিয়াছে। তিনি অনেক বুঝাইলেন, গোরাটা মদের নেশায় বিভোর, কার কথা কে শুনে? তখন শ্যামাকান্ত জোর করিয়া গোরাটাকে ধরিয়া আনিয়া আশ্রমে বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। পরদিন ভোরে তাহাদের অফিসারের নিকট সকল কথা বলিয়া দিয়া আসিলেন।

এই সময় শ্যামাকান্ত অনেক বই লিখেন। এই সমস্ত বইতে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সোঽহংগীতা, সোঽহংতত্ত্ব, সোঽহং-সংহিতা, বিবেকগাথা, Truth, ভগবদ্গীতার সমালোচনা—এই কয়খানাই প্রধান। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে গীতার সমালোচনা লিখিয়া যান। সাধনপথে তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী, জ্ঞানমার্গাবলম্বী।

শ্যামাকান্তের জীবনে ভয় বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। সামাজিক ভয়, শাস্ত্রের ভয়, পরলোকের ভয়, মরণের ভয়,—কোন প্রকার ভয় কোন দিন তাঁহার জীবনে ঠাঁই পায় নাই।

১৯১৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর হিমালয়ের শান্তিময় স্নিগ্ধ-ক্রোড়ে বাঙলাদেশের এই খাঁটী মানুষ সিংহপ্রতিম সন্ন্যাসী শ্যামাকান্ত নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।



পরেশনাথ

পরেশনাথ

ঢাকা শহরের অপর তীরে বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ পাড়ে শুভাঢ্যা গ্রামখানি অবস্থিত। এই গ্রামে ১২৬৩ সনের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৮৫৬ সালে) পূর্ব্ব-বাঙ্‌লার বিখ্যাত মল্লবীর স্বর্গীয় পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণের নিকট ইনি পার্শ্বনাথ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। পরেশনাথের বাবার নাম ৺সীতানাথ ঘোষ এবং তাঁহার ঠাকুরদাদার নাম ৺নীলমণি ঘোষ। ইঁহারা সকলেই বেশ সুস্থ-সবল ও দীর্ঘজীবী ছিলেন।

শুভাঢ্যা গ্রামে একটা মধ্য-বাঙ্গালা স্কুল ছিল। এখানেই পরেশনাথের বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত হয়। এই স্কুল হইতে চারি টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন এবং বাঙ্‌লা প্রবন্ধ রচনায় প্রথম স্থান লাভ করেন।

ছোটকাল হইতেই ব্যায়াম চর্চ্চার দিকে তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি গ্রামে একটা আখ্‌ড়া স্থাপন

করিয়া সেখানে গ্রামের ছেলেদের লইয়া মহোৎসাহে কুস্তি-কসরৎ শুরু করিয়া দিলেন।

১২৭৮ সনে শুভাঢ্যা গ্রামেরই ৺অদ্বৈতচরণ দত্ত মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স পনর কি ষোল বছর।

গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ করিয়া পরেশনাথ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন। এই সময়েই তাঁহার জীবনের গতি স্থির হইল এবং পরবর্ত্তী কালে শক্তিমত্তার জন্য তিনি যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহার ভিত্তি পত্তন হইল। লক্ষ্মী-বাজারের স্বর্গীয় অধর ঘোষ তখন নাম-করা পালোয়ান। পরেশ-নাথ এই সময় তাহার নিকট পরিচিত হইলেন। শ্যামাকান্তের সহিত এই সময়েই তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। পরেশনাথ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত শ্যামাকান্ত, স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ বন্ধুদিগকে লইয়া কুস্তি ও ব্যায়ামাদি আরম্ভ করিয়া দিলেন। অধর ঘোষ নিজেও একজন ভাল কুস্তিগীর ছিলেন। তার উপর এই সমস্ত যুবকদিগের তরুণ উৎসাহ তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরিল। তিনি সযত্নে ও সস্নেহে ইঁহাদিগকে কুস্তি শিখাইতে লাগিলেন।

১২৮৩—৮৪ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে পরেশনাথ এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেন। এই সময়টায় ইঁহাদের মনে সৈনিক হওয়ার সাধ জাগে। পরীক্ষা দিয়া তিনি শ্যামাকান্তকে সঙ্গে

লইয়া আড়া, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে বাহির হইলেন। এই সময় অনেক স্থানে তাঁহারা ঐ দেশীয় পালোয়ানদের সাথে কুস্তি লড়েন এবং শারীরিক কসরৎ দেখান। গোয়ালিয়রের মহারাজার পালোয়ানের সহিত কুস্তিতে পরেশনাথ বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন তাহা সফল হইল না। সৈনিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া বন্ধুদ্বয় দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

পরেশনাথ কলিকাতা আসিয়া সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তখনকার দিনে আই. এ. (এফ. এ.) তে অঙ্ক অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকেই অঙ্ক লইতে হইত। কিন্তু পরেশনাথ ইংরাজীতে বেশ পাকা হইলেও অঙ্কে ভয়ানক কাঁচা ছিলেন। আই-এ পরীক্ষার অঙ্কে ফেল হইলেন। তারপর আরো দুইবার পরীক্ষা দিলেন, প্রত্যেক বারেই অঙ্কে ফেল হইলেন। তিনবার একই পরীক্ষায় ফেল হওয়াতে পরেশনাথের শ্বশুর মহাশয় পড়ার খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরেশনাথ দমিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়-শক্তি ছিল। তিনি ছাত্র পড়াইয়া কলেজের পড়া চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব তরুণ-দলে খুব বেশী। পরেশনাথও সে প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া পরেশনাথ অনেক মহানুভব ব্যক্তির নিকট নানারূপ অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সিটি

কলেজের প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত এবং ডাঃ পি. কে. রায় অন্যতম। ইঁহারা পরেশনাথকে খুব স্নেহ করিতেন, ও উৎসাহ দিতেন এবং পরেশনাথও ইঁহাদিগকে অতিশয় ভক্তি করিতেন।

এইরূপে পাঁচ বৎসর চেষ্টার পর আই. এ. পাশ করেন। আই. এ. পাশ করিয়া ঢাকা কলেজে আসিয়া বি. এ. পড়িতে ভর্ত্তি হইলেন। ১২৯১ সালে অগ্রহায়ণ মাসে তিনি একবার খুব কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন এবং অনেকদিন শয্যাগত থাকেন। পরেশনাথ পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পর আর পড়াশুনা করেন নাই।

ছোটকাল হইতেই নৈতিক চরিত্রের উপর পরেশনাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার অন্তরের বন্ধু এবং প্রধান সহযোগী ও সহকর্ম্মী শ্যামাকান্ত তাঁহার আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

পরেশনাথের শারীরিক শক্তির চরম উৎকর্ষের কাল ১২৭৮—১২৯০ সাল এই বার বছর। এই সময়ে তাঁহার শরীর বিশাল ও সুষ্ঠু হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। শরীরটি ছিল সুগোল, বর্ণ অনুজ্জ্বল গৌর, শারীরিক সৌষ্ঠব অতুলনীয়। তাঁহার ওজন তখন ছিল-তিন মণ চৌদ্দ পনর সের। সব চেয়ে যখন তাঁহার বেশী ওজন হইয়াছিল, তখন চারি মণের উপরে গিয়াছিলেন।

পরেশনাথ কলেজের পড়া শেষ করিয়া ১২৯১—৯২ সালে ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। মরণ পর্য্যন্ত তিনি এই স্কুলের মাষ্টারী করিয়া গিয়াছেন। স্কুলে

তিনি ইংরেজী পড়াইতেন। পরেশনাথের আমলে যে সমস্ত ছেলের জুবিলী স্কুলে পড়িবার সুযোগ হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি একটা গভীর দাগ রাখিয়া গিয়াছে।

পরেশনাথ বড় অমায়িক ও সামাজিক লোক ছিলেন। তিনি হাস্যকর গল্প বলিয়া লোকদের হাসাইতে পারিতেন। পরেশনাথ ক্লাসের ছেলেদের মজার মজার রূপকথা ও হাসির গল্প বলিতেন।

সে সময়ে ঢাকা শহরে যত কুস্তিগীর পালোয়ান আসিয়াছেন, সকলেই পরেশনাথের আতিথ্য ও আদরে আপ্যায়িত হইয়াছেন। ঢাকা শহরে আসিয়া পরেশনাথের আখ্ড়ার মাটি না মাখিয়াছে এমন পালোয়ান সেকালে ছিল না। তখন ঢাকায় যত কুস্তির প্রতিযোগিতা হইত, সমস্তই পরেশনাথের পরিদর্শনে ও পরিচালনায় সম্পূর্ণ হইত। সকলেই পরেশনাথের বিচার মাথা পাতিয়া নিয়া খুশী হইয়া চলিয়া যাইত।

পরেশনাথের সন্তান-সন্ততির মধ্যে দুইটি মেয়ে মাত্র বর্ত্তমান। তাহারা উভয়েই বিবাহিতা। তাঁহার দুইটি ছেলেও হইয়াছিল, কিন্তু শৈশবেই মারা যায়। ১৮৯১ সালে পরেশনাথের পত্নীবিয়োগ ঘটে। সহধর্ম্মিণীর শোক তিনি খুব ধীরভাবে সহ্য করেন।

পরেশনাথ শেষ জীবন পর্য্যন্তও ব্যায়াম করিতেন। কিন্তু ব্যায়াম তাঁহার পক্ষে যথোপযুক্ত না হওয়াতে তাঁহার শরীর শেষ বয়সে অতিরিক্ত মোটা হইয়া পড়িয়াছিল। উহাতে তাঁহার চলিতে ফিরিতে বেশ কষ্ট বোধ হইত। শেষ বয়সে স্কুলে

যাতায়াতের সময়েও দেখিয়াছি, রাস্তায় বার তিনেক বিশ্রাম না করিয়া যাইতে পারিতেন না।

পরেশনাথ তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতেন। সেবার জন্মাষ্টমীর সময় তিনি অন্যান্য ছেলেদের সাথে তাঁহাদের স্কুলের সামনে মিছিল দেখিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন। এই জায়গায় বরাবরই মিছিলের সময় খুব ভীড় হয়। সেবার একটি ছেলে বালক-সুলভ চপলতাবশতঃ মিছিলের হাতীর গায়ের ঝালরটা একটু উঁচু করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতেই একটা পুলিশ ছেলেটার উপর রেগুলেশন লাঠি চালায়। অমনি পরেশনাথ, শ্যামাকান্ত, অমর ঘোষ সকলে দৌড়াইয়া আসেন। তাঁহারা প্রতিবাদ করাতে পুলিশের সাথে ঝগড়া হয়। অনেক রিজার্ভ মিলিটারী পুলিশ ঘটনা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। শুনা যায়, কোন পক্ষই পশ্চাৎপদ না হওয়াতে ব্যাপারটা নাকি বড়ই সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল।

পরেশনাথ যখন কলিকাতা সিটি কলেজে এফ্. এ. পড়িতেন, সেই সময়ে কোন কারণে সর্ব্বজনবরেণ্য দেশ-নায়ক স্বর্গীয় সুরেন্দ্র-নাথের জেলের হুকুম হয়। ইহাতে ছাত্রসমাজ বিচলিত হইয়া উঠে এবং নানারূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে কলিকাতা-বাসীরাও ঢাকার পরেশনাথের অনেকটা পরিচয় পাইয়াছিলেন।

একবার পরেশনাথ কলিকাতার এক জুতার দোকানে জুতা কিনিতে যান। এক জোড়া জুতা পছন্দ করিয়া দর জিজ্ঞাসা

করেন। বিক্রেতার দর শুনিয়া পরেশ বাবু নিজেও একটা দর বলেন। উত্তরে লোকটা বলে—ও দামে একখানা জুতো নিতে পার। এই অপমানকর কথায় পরেশনাথ ভীষণ রাগিয়া যান। লোকটিও নরম না হইয়া আরো গরম হইয়া উঠে। তখন পরেশনাথ লোকটিকে হাতে কলমে বেশ একটু ভদ্রতা শিক্ষা দেন। ফলে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। স্থানীয় বহুলোক আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। একক পরেশনাথ ক্রুদ্ধ জনতাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া বিজয় গর্বে ফিরিয়া আসেন।

পরেশনাথ ও শ্যামাকান্ত একবার রাজপুতনায় কসাইদের এক আখ্ড়ায় যাইয়া উপস্থিত হন এবং তাহাদের সহিত কুস্তি লড়িতে চাহেন। শ্যামাকান্ত একে একে সেই আখ্ড়ার সমস্ত সাকরেদ ও তাহাদের ওস্তাদকে পরাস্ত করেন। শ্যামাকান্তের কুস্তির প্যাঁচ অপেক্ষা তাঁহার হাত দুইটিতে অসম্ভব রকম জোর ছিল। তিনি উহাদের এক একটার ঘাড়ে হাত দিয়া এমন ঘা মারিলেন যে এক ঘা'তেই সে বসিয়া পড়িল। তার পর এক-একটাকে ধরিয়া এক আছাড় মারেন, আর চিৎ করেন। পরিশেষে ওস্তাদও যখন হারিয়া গেল, তখন লোকগুলি একেবারে ক্ষেপিয়া পরেশনাথ ও শ্যামাকান্তকে মারিতে উঠিল। তখন তাঁহারা উহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া রাজপুতদের আর এক আখ্ড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বেশ আদর-যত্ন পাইলেন। কসাইরা বাঙালী লড়্নেওয়ালা দেখিয়া প্রথমে অবজ্ঞা ও টিট্কারি দিয়াছিল।

কিন্তু বাঙালীর এই শক্তির পরিচয়ে তাহাদের আস্পর্দ্ধা নষ্ট হইল।

পরেশনাথের জীবনের সাহসিকতার গল্প বলিয়া শেষ করা যায় না। ঢাকা শহরের অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার সাহসিকতার স্মৃতি মাখানো রহিয়াছে। তখনকার দিনে ঢাকা শহরের ভদ্রলোকের মান-সম্মান নিরাপদ ছিল না। গুণ্ডা-বদমায়েসদের জন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথই সর্ব্বপ্রথম ইহাদের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং এইজন্য অনেক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শিক্ষিত ছেলেদের ভিতর তখন এমন একটা উৎসাহ আসিয়াছিল যে ডাঃ পি. কে. রায়ের মত লোকও অধর ঘোষের আখ্ড়ায় ল্যাঙট্ কষিয়া ডন-কুস্তি করিতেন। কিন্তু যাহাদের বাড়ীঘর ও মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ইঁহারা বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইতেন, তথা-কথিত সেই ভদ্র সমাজেরই অনেকে আবার শ্যামাকান্ত-পরেশনাথকে 'ষণ্ডা-গুণ্ডা' নামে অভিহিত করিতে ত্রুটি করিত না। হায় রে দুর্ভাগা দেশ!

পরেশনাথ ১৯২৩ সালে আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে ঢাকা শহরেই মারা যান। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার দেহ নদীর পরপারে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহাদের নিজেদের গ্রামেই তাঁহার নশ্বর দেহের শেষ কার্য্য নিষ্পন্ন করা হয়।



ভীম ভবানী



ভীম ভবানী

ভীম ভবানী

কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটের সাহা-গণ বর্দ্ধিষ্ঠ গৃহস্থ ও বিশেষ পরিচিত। ইঁহাদের বংশের ৺উপেন্দ্রনাথ সাহা শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার নয় ছেলে, মধ্যমটি বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর ও কুস্তিগীর ভীম ভবানী।

ভীম ভবানীর আসল নাম ভবেন্দ্রনাথ সাহা। বাঙ্লা ১২৯৮ সালে ভবানীর জন্ম হয়। ছোটকালে ভবানী বড় রোগা ছিলেন। চৌদ্দ পনর বছর পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া ভুগিয়া একেবারে শীর্ণকায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডি. গুপ্ত খাইয়া যদি বা একবার কিছুটা আরোগ্য লাভ করেন, আবার জ্বর আসিয়া, ভূতের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসে। ভবানীর মনে না আছে শান্তি না আছে লেখাপড়ার উদ্যম উৎসাহ। শরীর সুস্থ না থাকিলে মনও ভাল থাকে না, সুস্থচিত্ত না হইলে লেখাপড়াও হয় না।

এই সময়ে দর্জ্জিপাড়ার (কলিকাতা) ক্ষেতু গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে মস্ত-বড় কুস্তির আখ্‌ড়া। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ হইতে ক্ষেতুবাবুর আখ্‌ড়ায় নামকরা পালোয়ানগণ কুস্তি লড়িতে আসিত। 'ক্ষেতুবাবুর আখ্‌ড়ার মাটি না মাখিয়াছে এমন পালোয়ান তৎকালে ভারতবর্ষে ছিল না।' তখনও ক্ষেতুবাবু বাঁচিয়া আছেন। ভবানী ক্ষেতুবাবুর আখ্‌ড়ায় সাগ্‌রেদ (শিষ্য) হইয়া ভর্ত্তি হইলেন। এই আখ্‌ড়ায় বাঙালীর গৌরব জগৎ-জয়ী কুস্তিগীর গোবরবাবুও এই সময়ে কুস্তি শিখিতেন। ভবানী আখ্‌ড়ায় ভর্ত্তি হইয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আসিয়া উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে কুস্তি শিখিতে লাগিলেন।

শারীরিক শক্তিসঞ্চয় সাধনার বিষয়। তুচ্ছ বা অবহেলা করিলে এ সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না। আমাদের ছেলেদের সব চেয়ে বড় দোষ, তাহারা বুল্‌ডগের মত আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের ইচ্ছা আছে, শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, সবই আছে, নাই শুধু বাঁচন-মরণ তুচ্ছ করিয়া জিনিষটাকে নাছোড়-বান্দার মত জড়াইয়া ধরিয়া থাকার ক্ষমতা। জাতীয় চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমরা সঙ্কল্প করি ত আরম্ভ করিনা, আরম্ভ করি ত শেষ করিনা'। শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চা সম্বন্ধে কথাটা হাড়ে-হাড়ে সত্য। ছেলেরা দুইদিন ডন-কসরৎ করিয়া যদি শরীরের কোন ইতর-বিশেষ লক্ষ্য না করে তাহা হইলেই অমনি একেবারে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া

পড়ে ; কার কসরৎ কে করে ? যদি বা সৌভাগ্যক্রমে কাহারো শরীর একটু বাড়িতে থাকে, তবে ত কথাই নাই, অমনি শাস্ত্র-বাক্য আওড়াইয়া স্বল্প-সন্তুষ্ট আশুতোষ হইয়া পড়ে। এই দোষটা যেমন করিয়া হোক শোধরাইয়া নিতে হইবে, নহিলে শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য লাভ ত দূরের কথা, শরীরটা শুধু ম্যালেরিয়া আর ডিস্পেপসিয়ার আস্তানা হইয়া পড়িবে। অভিমানী ভবানীর এই আঁকড়িয়া থাকার অভ্যাস ছিল না বলিয়াই তিন চারি বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত শীর্ণ শরীরটাকে তিনি এরূপ রূপান্তরিত করিয়াছিলেন যে, প্রসিদ্ধ ব্যায়াম-বীর রামমূর্ত্তি পর্য্যন্ত উনিশ বছরের ছেলের এরূপ ভীমকান্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। সেই কথাটাই বলিতেছি।

"ভবানীর যখন ১৯ বৎসর বয়স তখন সুপ্রসিদ্ধ রামমূর্ত্তি কলিকাতায় খেলা (সার্কাস) দেখাইতে আসেন। ভবানী খেলা দেখিতে গিয়াছেন। তাবুতে তিল ধারণের স্থান নাই, ভবানী হতাশ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ কাহার কর-স্পর্শে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দর দীর্ঘকায় ব্যক্তি। এমন বীরমূর্ত্তি ভবানী আর কোন দিন দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। আগন্তুক নির্নিমেষ নেত্রে ভবানীর দিকে চাহিয়াছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি খেলা দেখিতে আসিয়াছ ?" তাহাই উদ্দেশ্য শুনিয়া আগন্তুক ভবানীর হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "তুমি

আমার সঙ্গে আইস; আমি তোমাকে ভাল জায়গা দিতেছি।”

তাঁবুর মধ্যে যেখানে দলের লোকেরা বসিয়া—দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে একখানা আসন দেখাইয়া দিয়া তিনি ভবানীকে বলিলেন, “বস”।

বীরকায় পুরুষ স্মিত নেত্রে ভবানীর অপূর্ব্ব অঙ্গ-সৌষ্ঠব লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তোমার বয়স কত?”

ভবানী বলিলেন—“উনিশ।”

“এই বয়সে তোমার এমন শরীর! আমি অনেক কুস্তিগীর পালোয়ান দেখিয়াছি। এমন অঙ্গ-সৌষ্ঠব, বীরোচিত অঙ্গ-গঠন ত দেখি নাই! তোমার মত যুবক পাইলে আমার সর্ব্ববিদ্যা দিয়া পারদর্শী করিয়া তুলি।”

ভবানী তখনই জানিতে পারেন, ইনিই সুবিখ্যাত প্রফেসার রামমূর্ত্তি। ভবানীও রামমূর্ত্তির বীরপণা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; তাঁহার বীর-বপুর দিকে চাহিতে চাহিতে ভবানীর তরুণ হৃদয়ে যেন একটা তুফান বহিল। খেলা ভঙ্গে রামমূর্ত্তি আবার সস্নেহে ভবানীকে আহ্বান করিলেন; আবার বলিলেন, “যদি তোমার মত যুবক পাইতাম—ইত্যাদি।”

ভবানী মাকে আর একথা বলিলেন না। বলিলে বিধবা জননী তো ছেলেকে এমন বিপদ-সঙ্কুল কাজে যাইতে দিবেন না।

ভবানী রাতারাতি একদিন রামমূর্ত্তির দলের সহিত পলাইয়া একেবারে রেঙ্গুন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুর, যাভা প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রামমূর্ত্তি যখন যবদ্বীপে তখন সেখানকার একজন ওলন্দাজ কুস্তিগীর তাঁহার সহিত কুস্তি লড়িতে চাহিলেন। রামমূর্ত্তি তো অস্বীকার করিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে নিজেরই অসম্মান। কেহ দঙ্গল বা প্রতিযোগিতায় কুস্তি লড়িতে চাহিলে কুস্তিগীর যিনি তাহাকে অন্ততঃ নিজের মান-মর্য্যাদার জন্যেও লড়িতে হয়। না-লড়াই বড় নিন্দার কথা। রামমূর্ত্তি রাজী হইলেন। নিকটেই ভবানী ছিলেন, তিনি বলিলেন—ওস্তাদজী আমি আপনার সাক্‌রেদ। উনি আগে আমার সঙ্গে লড়ুন, তারপর তো আপনি আছেনই।

রামমূর্ত্তি খুশী হইয়া বলিলেন, "বহুত আচ্ছা বেটা—লড়ো।"

তিন মিনিটে সাহেবের কুস্তির সাধ মিটিল। ভবানীর প্রথম প্রতিযোগিতাই সফল হইল।

কিন্তু রামমূর্ত্তির দলে ভবানীর বেশীদিন থাকা পোষাইল না। ভবানী বাড়ী ফিরিলেন।

ভবানী বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। প্রফেসার কে. বসাকের সার্কাস তখন নাম-করা, সমস্ত এসিয়াখণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ভবানী ইহাদের দলে গিয়া পড়িলেন। এখন

হইতে ভবানী স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে খেলা দেখাইবার সুযোগ পাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন।

সাংহাইতে একজন আমেরিকান পালোয়ান ভবানীকে কুস্তিতে আহ্বান করে। বাজী ১,০০০ ডলার। লোকটা হারিয়া যায় এবং ১,০০০ ডলার ঘাট্তি দিয়া মুখ কালো করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু লোকটা প্রতিশোধ লইবার জন্য ভবানীকে নিহত করিবার চেষ্টা করে। ভবানী স্থানীয় কনসালকে জানাইলেন। কনসালের চেষ্টায় ভবানীর জীবন রক্ষা হয়। কনসাল ভবানীর শক্তিপরীক্ষার জন্য বলিলেন, আমি মোটর চালাইব, ভবানী যদি গাড়ী থামাইতে পারেন, গাড়ী তাঁহার। ভবানীর চেষ্টা সফল হইল, তিনি নূতন মিনার্ভা গাড়ীখানা পুরস্কার পাইলেন। ভবানী দুইখানা মোটর টানিয়া রাখিতে পারিতেন। একবার তিনখানা রাখিয়াছিলেন। সে ঘটনা পরে বলিতেছি।

ভবানী ৫ মণ ওজনের বারবেল অল্প আয়াসেই ভাঁজিয়া দেখাইতেন। সিমেণ্টের পিপের উপর ৫।৭ জন লোক বসাইয়া পিপের ধার দাঁত দিয়া উঠাইয়া শূন্যে ঘুরাইতেন। বুকের উপর চল্লিশ মণ পাথর চাপাইয়া বিশ পঁচিশটি লোককে বসিয়া খেয়াল খাম্বাজ গাহিবার অবসর দিতেন। সর্ব্ব শরীর লোহার শিকল আবদ্ধ করিয়া পলকের মধ্যে মট্মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। ভবানীর বুকের ও উরুর উপর দিয়া একই সময়ে দুইখানা গরুর

গাড়ী পঞ্চাশজন লোক লইয়া চলিয়া যাইত, ভবানী পাষাণমূর্ত্তির মত পড়িয়া থাকিতেন।

জাপান-সম্রাট্ মিকাডো মহোদয় ভবানীর শক্তির পরিচয় পাইয়া একবার তাঁহাকে একখানি স্বর্ণ-পদক ও ৭৫০৲ টাকা পুরস্কার দেন।

এইরূপে সমগ্র প্রাচ্যখণ্ড বিজয় করিয়া বাঙালীর মুকুট-মণি ভবানী গৌরবোজ্জ্বল কিরীট পরিয়া দেশের মাটিতে পা দিলেন। চারিদিকে বঙ্গবীরের জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

একবার ভরতপুরের মহারাজ ভবানীকে তিনখানা মোটর ধরিয়া থামাইতে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। ভবানী এ পর্য্যন্ত দুইখানা মোটরই থামাইয়া আসিয়াছেন, তিনখানা মোটর আবার কি ভাবে থামাইবেন! মহারাজ বলিয়াছেন,—এইবার বুঝিব বাঙালী কেমন বীর! ভবানী কহিলেন,—মহারাজ আয়োজন করুন। মহারাজ নিজে, রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রী তিন জনে তিনখানা মোটর চাপিয়া বসিলেন। ভবানী গাড়ীগুলির পিছনে মোটা দড়ি বাঁধিয়া দুই হাতে দুইটি ধরিলেন, আর একটি কোমরে বাঁধিলেন; তার পর বলিলেন, Go—চালাও। তিন জনেই সমানে ষ্টার্ট দিলেন। স্পীডোমীটারে দেখা গেল ইঞ্জিন পুরাদমে চলিতেছে, কিন্তু গাড়ী এক ইঞ্চিও নড়িল না। পিছনের চাকা শূন্যে উঠিয়া খরর্ খরর্ শব্দ করিতে লাগিল। মহারাজ গাড়ী হইতে নামিয়া বাঙালী বীর-যুবকের কর-মর্দ্দন করিলেন।

ভীম ভবানী

একবার মুর্শিদাবাদের নবাবের হাতীশালে একটা বুনো হাতী আনা হয়। হাতীটা লম্বায় ৯ফুট সাত ইঞ্চি, ওজনও সাধারণ হাতীর চেয়ে বেশী। নবাব সাহেবের ইচ্ছা এই হাতীটা ভবানী বুকের উপর দিয়া চালাইয়া নিতে পারেন কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন! হাতী বুকের উপর দিয়া চালাইয়া লইবার ক্ষমতায় ভবানীর গুরু রামমূর্ত্তি। রামমূর্ত্তিও পোষা সার্কাসের হাতী ছাড়া এ পর্য্যন্ত অন্য হাতী বুকের উপর লন নাই! ভবানীও এ পর্য্যন্ত অন্য হাতী লইবার চেষ্টা করেন নাই। নবাব সাহেবের সন্তুষ্টি বিধানার্থ ভবানী জানাইলেন, তিনি বুকের উপর হাতী চালাইতে প্রস্তুত আছেন। সার্কাসের হাতী সাধারণতঃ অনাহার ও অর্দ্ধাহারে দুর্ব্বল ও শীর্ণ থাকে, কিন্তু এমন বন্য পশু বুকে তুলিবার দুরাশা কেউ কখনও করে নাই। ভবানী যখন সেই বন্য হাতীটাকে বুকের উপর চালাইয়া দিয়া অক্ষত ও সুস্থদেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন হাজার কণ্ঠে ভবানীর জয়ধ্বনি ও করতালি পড়িয়া গেল। বাঙ্‌লার লাটসাহেব নিজেও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন।

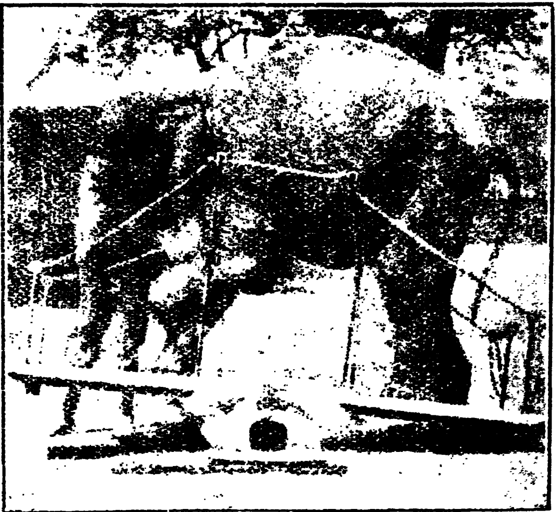
ভবানী ১২০ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া শাল, আলোয়ান, আংটি, মোটর গাড়ী, নগদ টাকাও যথেষ্ট পাইয়াছিলেন।

একবার কলিকাতা স্বদেশী মেলায় ভবানী তাহার অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র,



গোবর

(১৯ বৎসর বয়সে ২ মণ ওজনের
হাঁসলি গলায় পরিয়াছেন)



ভীম ভবানী

(হাতী বুকে লইয়াছেন)

অমৃতলাল প্রভৃতি সকলেই সেই মেলায় উপস্থিত ছিলেন। ভবানীর খেলা দেখিয়া রসরাজ অমৃতলাল নাকি বলিয়াছিলেন, "মহাভারতের ভীম এমনি একজন বীর ছিলেন। তুমি দেখিতেছি কলিকালের ভীম। আজ হইতে আর তুমি শুধু ভবানী নহ, তুমি ভীম ভবানী।"

সেই হইতে ভবেন্দ্রনাথ ভীম-ভবানী নামেই পরিচিত হইলেন। পশ্চিমাঞ্চলে লোকে ভবানীকে ভীমমূর্ত্তি বলিত।

ভবানী ৩১ বৎসর বয়সে ১৩২৯ সালে মারা যান। তিনি বিবাহ করেন নাই। নিজে খুব সাদাসিধা ভাবে চলিতেন, বাবুগিরি বিলাসিতা মোটেই তাঁহার ছিল না।

ভবানী মৃত্যুর পূর্বে আগাসীর সার্কাসে সাপ্তাহিক দেড়শত টাকা বেতনে খেলা দেখাইতেন।

প্রাতে ২০০ বাদামের সরবৎ, এক ছটাক গাওয়া ঘি; মধ্যাহ্নে সাধারণ ভাত ডাল; অপরাহ্নে ২৲ বা ২৷৹ টাকার ফল ও ৫০টি বাদামের সরবৎ ও এক সের মাংস; রাত্রে আধসের আটার রুটি ও তিন পোয়া মাংস—ইহাই ছিল ভীম ভবানীর দৈনন্দিন আহার।



গোবর

গোবর

ইংরাজী ১৮৯৯ সালের ১৩ই মার্চ্চ কলিকাতার মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে এক পালোয়ান-গোষ্ঠীতে বাঙ্‌লার ভবিষ্য জগৎ-খ্যাত কুস্তিগীর গোবর বাবু জন্মগ্রহণ করেন। গোবর বাবু জন্মের সময় এত মোটা ছিলেন যে ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন, ছেলে বাঁচিবে না।

গোবরবাবুর ভাল নাম শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ। ইঁহারা দীর্ঘকাল যাবৎ কলিকাতায় বাস করিতেছেন এবং শিবু গুহের পরিবার বলিয়া বিখ্যাত।

গোবর বাবুর কুস্তি-কৌশল তাঁহার বংশের অবদান। তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুহ মহাশয় অদ্বিতীয় কুস্তিগীর ছিলেন। ইনিই আমাদের বাঙালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সমস্ত ভারতবর্ষে কুস্তিতে নাম করেন। শুনা যায়, কুস্তিবিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ সেকালে ভারতবর্ষে কমই ছিল। অম্বুবাবু নিজে খুব

নামকরা ধনী ছিলেন, কুস্তির চর্চ্চা ও উৎসাহের জন্য অনেক অর্থব্যয়ও করিয়া গিয়াছেন। এই লক্ষপতি কুস্তিগীর কুস্তি শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে খরচ করিয়াছেন। তিনি সৌখীন ছিলেন, ব্যবসায় হিসাবে বা অর্থোপার্জ্জনের জন্য কুস্তি লড়িতেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত বাঙ্‌লায় কতকগুলি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দেশময় এই ব্যায়াম চর্চ্চাটা ছড়াইয়া দিয়া দুর্ব্বল বাঙালীকে সতেজ ও সজীব করিয়া তোলা।

অম্বুবাবু মারা যাওয়ার পর তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় ক্ষেত্রচরণ গুহ মহাশয় পিতার নাম ও যশ অর্জ্জনে সমর্থ হন, এবং ইনিও একজন ভারত-বিখ্যাত কুস্তিগীর হইয়া উঠেন। ক্ষেত্রবাবু গোবরবাবুর জ্যেঠা মহাশয়। কলিকাতায় ক্ষেত্রবাবুর আখড়া সমস্ত বাঙলা ও পশ্চিমাঞ্চলের নামজাদা পালোয়ানদের একটা বড় আড্ডা ছিল।

ক্ষেত্রবাবু যখন মারা যান, গোবর বাবুর বয়স মোটে তের বছর। সে সময় এমন কেহ উপযুক্ত ছিল না যে এই বংশের অবদানটির মর্য্যাদা ও সম্মান রাখিতে পারে। দুই পুরুষের এই কুস্তির চর্চ্চাটা এক রকম উঠিয়া যাইবার যোগার হইয়া উঠে। তখন গোবরবাবুর বাবা রামচরণ গুহ মহাশয় পুত্রকে ব্যায়াম চর্চ্চা করাইতে সুরু করিলেন। ইনিও যৌবনে কুস্তি করিতেন এবং এদিকে তাঁহারও অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে ল্যাঙট্ কষিয়া তিনি গোবর বাবুকে দাঁও প্যাচ শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। বড় বড় নামজাদা পালোয়ানদের দেখাইবার জন্য

গোবরবাবুকে সঙ্গে লইয়া পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। গোবরবাবুর কুস্তি শেখাবার জন্য গামা, কাল্লু, রহমানী প্রভৃতি নামকরা পালোয়ানগণ নিযুক্ত ছিলেন। ইহারা প্রত্যহ প্রত্যেকে চারি টাকা হইতে ছয় টাকা বেতন পাইতেন।

রামচরণ বাবু পুত্রের জন্য যেমন একদিকে শরীর-চর্চার কলোকরা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তেমনি আবার পুত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য এবং উচ্চ ভাব-প্রবাহ জীবনে বর্তমান রাখিবার জন্য সর্বদা বলিতেন,—'বাঙালী যে দুর্বল ইহা মিথ্যা, তোমার জীবন দিয়া একথা প্রমাণ করিয়া জোর গলায় বলিতে হইবে। ভগবান তোমাকে এমন একটা শরীর যখন নেহাৎই দিয়াছেন, ভাল করিয়া সাধনা কর। ফলাফল ভগবান জানেন, উহা তাঁহারই হাতে।' আজ যে গোবরবাবুর দিগ্বিজয়ী বেশ দেখিয়া আমাদের বুক গর্বে ফুলিয়া উঠে তাহার মূলে তাঁহার পিতার একান্ত উৎসাহ ও অর্থব্যয়। বুড়ো বয়সেও তিনি গোবর বাবুকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, তোমার দাদামহাশয়ের সঙ্কল্পের কথা যেন সব সময় তোমার স্মরণ থাকে। মনে রাখিও, তাঁহার অতৃপ্ত আত্মার কাতর দৃষ্টি তোমার দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে।

গোবর বাবু ছোটকালে বাড়ীতেই পড়িতেন। তারপর মেট্রোপলিটান স্কুলে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর স্কুল) ভর্তি হন। এখান হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর কিছুকাল ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করেন এবং আমেরিকা হইতে পত্র-ব্যবহারে



(১৯ বৎসর বয়সে ১মণ ১০ সের ওজনের এক একটি মুগুর ভাজিতেছেন

(by correspondence) সমাজ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন।

১৯১০ সালের মার্চ্চমাসে গোবরবাবু প্রথম য়ুরোপ যান। তখন তাঁহার বয়স সতর বছর মাত্র। এই সময়ে ইনি মাত্র তিন মাস বিদেশে থাকিয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেই গোবরবাবুর বিবাহ হয়। গোবরবাবুর ছেলেরাও বাপের কাছে বেশ কুস্তি-কসরৎ শিখিতে শুরু করিয়াছে।

১৯১২ সালে আবার গোবরবাবু য়ুরোপ যাত্রা করেন। এবারকার দিগ্বিজয়ের বিবরণ খানিকটা একখানি বিলাতী কাগজের তর্জ্জমা ("প্রবাসী") হইতে তুলিয়া দিলাম।

"Gobar the 18 stone Boy-Wrestler from India who wears a collar, 160 lbs in weight"—ভারতবর্ষের বালক-পালোয়ান গোবর—ওজন তিন মণ। সে গলায় দুই মণ ওজনের একটি হাসলি পরে।

"হ্যাম্পস্টেডে একটি বাড়ীর পেছনে একটি বাগানে আমি গোবরকে প্রথম দেখি। ঘাসের উপর একটি মাদুর বিছান, তার উপর সেই অদ্ভুত বিশালকায় প্রায় তাঁরই মত প্রকাণ্ড ইংরাজ পালোয়ান ফিল লেনের সঙ্গে কুস্তি লড়্‌ছিল। ফিল খুব হাঁপাচ্ছিল, গোবরকে বেদম করতে খুব চেষ্টা করছিল। কিন্তু গোবর কোনক্রমেই বেদম হচ্ছিল না।

"গোবর সবে মাত্র কুড়ি বৎসর অতিক্রম করেছে; কিন্তু কি ভীষণ যুবা! দৈত্যের মত তার দেহ! সে একটা প্রকাণ্ড বালকের মত—চোখ উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। জীবনটা তার কাছে আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে ভরা, সে এখন বলবান্ এবং বলশালিতার গৌরব খুব অনুভব করে।

"গোবর বিলাতী খাদ্য ছোঁয় না। সব তার চাকররা রেঁধে দেয়। সে খুব পক্ষীমাংস ও মাখন খায়। তা ছাড়া বাদাম চিনি প্রভৃতি দিয়ে তৈরী এক রকম উপাদেয় জিনিষ (সরবৎ ?) তার ভারী প্রিয়। সে মদ স্পর্শও করে না। সিগারেট মাসে হয়ত এক আধবার টানে।

"তার দু' জোড়া মুগুর আছে। এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন পঁচিশ সের। আর এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন এক মণ দশ সের।"

১৯১৩ সালের ২৭শে আগষ্ট তিনি স্কটল্যাণ্ডবাসী ভারী ওজনদার পালোয়ান জিমি ক্যাম্বেলকে হারাইয়া Scottish championship (স্কটীশ চ্যাম্পিয়ানশিপ) পান। ঐ বছরই ৩রা সেপ্টেম্বর এডিনবরার ওলিম্পিক অডিটোরিয়মে অজেয় জিমি এসেনকে (The Unconquerable Jimmy Essen) পরাজিত করিয়া Championship of the United Kingdom (চ্যাম্পিয়ানশিপ অব দি ইউনাইটেড কিংডম) লাভ করেন। ফরাসী-বীর মুষ্টিযুদ্ধ-নিপুণ কার্পেন্টিয়ার ছাড়া এত অল্প

বয়সে এ সম্মান আর কেহ পায় নাই। তারপর গোবরবাবু প্যারী যান। বিখ্যাত 'নোভো সার্ক টুর্নামেণ্ট' (Novo cirque tournament) সেখানে য়ুরোপের অনেক বড় বড় পালোয়ানকে হারাইয়া দেন। ইহাদের ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কুস্তি হয় জর্মন দিগ্বিজয়ী কার্ল শাপেটর সহিত (Karl Saft the German Champion)। সে কুস্তিটায় তিন ঘণ্টা পাঁচশ মিনিট কাল ধরিয়া লড়িতে হইয়াছিল। এখানে গোবর বাবুর কুস্তি চর্চ্চার সহযোগী (training partner) ছিলেন জেবিস্কো (Zbysco), ডিক্ শিকত (Dick Shikat) ও জর্জেস হ্যাকেনস্মিট (Georges Hackenshmidt)। বিদেশের বিজয়-মালা গলায় পরিয়া ১৯১৫ সালে গোবরবাবু দেশজননীর কোলে ফিরিয়া আসিলেন

১৯১৬ সালে জুলাই মাসে কোলাপুরের মহারাজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান 'গণ্পু'র সহিত লড়িবার জন্য সেখানে যান; মহারাজ নিজেও একজন ভাল কুস্তিগীর ছিলেন। গোবরবাবু ও 'গণ্পু'র কুস্তি হইল পুরা দুই ঘণ্টা। কুস্তিটি সমান-সমান হইয়াছিল।

তারপর ১৯২০ সালের ভারতের বিখ্যাত পালোয়ান বড় গামার সহিত গোবরবাবুর কুস্তি ঠিক হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কুস্তির আট দিন আগে গোবরবাবু ডিপথেরিয়ায় মরণাপন্ন হইয়া পড়েন এবং কুস্তি বন্ধ হইয়া যায়।

এই সালেরই অক্টোবর মাসে গোবরবাবু তাহার উপযুক্ত শিষ্য বনমালীকে লইয়া মার্কিন দেশে যান। গোবরবাবু সেখানে সব নামজাদা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিয়াছেন। ১৯২১ সালের ২৪শে আগস্ট সান ফ্রান্সিস্কো শহরে অ্যাড্ স্যান্টেলকে (Add Santel) হারাইয়া লাইট্ হেভী ওয়েট্ চ্যাম্পিয়ানশিপ (Light Heavy-Weight Championship of the World) লাভে জগৎখ্যাতি প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া গোবরবাবু স্ট্র্যাংলার লুই (Strangler Lewis), যুডিস্কো ব্রাদার্স (Zudisco Brothers), জো স্টেচার (Joe Stechare) প্রমুখ মার্কিন মল্লবীরদের সাথেও কুস্তি লড়িয়াছেন। সুবিখ্যাত স্ট্র্যাংলার লুই তখন পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। গোবরের সঙ্গে তাঁর দংগল হলে প্রথমবার গোবর জিতেন, দ্বিতীয় বার লুই, কিন্তু তৃতীয়বার লুই 'ফাউল' করে গোবরকে ফেলেন। প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিচারক লুইকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। গোবরই একমাত্র ভারতীয় পালোয়ান যিনি সরকারি ভাবে আমেরিকায় গৃহীত হন।

এইরূপ ছয় বছর আমেরিকায় ঘুরিয়া ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গোবরবাবু ভারতে ফিরিলেন। তাঁহার ইচ্ছা দেশে থাকিয়া পিতামহের সঙ্কল্পটা কাজে পরিণত করা। ইনি বলেন—"আমার ইচ্ছা যাহাতে দেশের শিক্ষিত লোকের ভিতর ব্যায়াম-চর্চ্চা ঢুকে তাহার চেষ্টা করা। যাহাতে সুস্থ ও সবলদেহ ছেলেরা

সমাজ ও দেশের কাজ করিতে পারে তাহারই যোগ্য করিয়া তোলা।”

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় গোবরের সঙ্গে গামার (ছোট) কুস্তি হয়। উহাতে গামা জয় লাভ করেন।

অনেকের ধারণা কুস্তি-কসরৎ করিতে হইলেই পেশ্‌-বাদাম আর কালিয়া-কোর্ম্মা চাই, নচেৎ হিতে বিপরীত ঘটে। গোবর বাবু কিন্তু ভাতের ভক্ত। তিনি বলেন—সাধারণ খাদ্যেই আমাদিগকে স্বাস্থ্যবান্‌ ও শক্তিমান করিয়া তুলিতে পারে যদি সংযমী হওয়া যায়, আর রীতিমত আমাদের দেশী ব্যায়ামগুলি সুষ্ঠু ভাবে করা যায়।

যাহারা বাঙালীর দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের জন্য বাঙ্‌লার জলবায়ুকে দোষ দেন তাহাদিগকে গোবরবাবুর এই কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখিতে বলি,—“পৃথিবীর এত দেশ তো বেড়িয়ে এলুম, কিন্তু বাংলা দেশে আমার শরীর যেমন ভালো থাকে এমন আর কোথাও নয়।”

ইনি আরো বলেন—সাহেবেরা যেমন massage (মেসেজ্‌) করেন, আমাদেরও ডলন-মলন শরীর-চর্চ্চার জন্য বিশেষ আবশ্যক। উহাতে শরীরের খুব দ্রুত উন্নতি হয়।

বর্ত্তমানে গোবর-বাবু কলিকাতা নিজের ব্যায়ামাগারে শরীর চর্চ্চা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গোবরবাবুর শরীরের ওজন ৩ মণ ২০ সের (যখন আঠার বছর বয়স)।

তাঁহার শরীরের পরিমাণ এইরূপ—

দৈর্ঘ্য ৬ ফিট্ ১ ইঞ্চি।

বুক ৪৮—৫০ ইঞ্চি, গলা ১৮॥০ ইঞ্চি।

কোমর ৪২ ইঞ্চি, জানু ৩০ ইঞ্চি।

ভারতীয় অতিকায় কুস্তিগীরদের একটি ক্রমিক তালিকা গামা এইরূপে নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে গোবরবাবু নবম স্থান অধিকার করেন।—

(১) গামা।

(২) ইমাম বক্স (রুস্তম-ই-হিন্দ্)

(৩) (ক) গুঙ্গা।

(খ) হামিদা।

(গ) ছোট গামা।

(ঘ) ইয়াকাপ্পা বুলার।

(৪) আতু খান।

(৫) দৌলা মুহম্মদ।

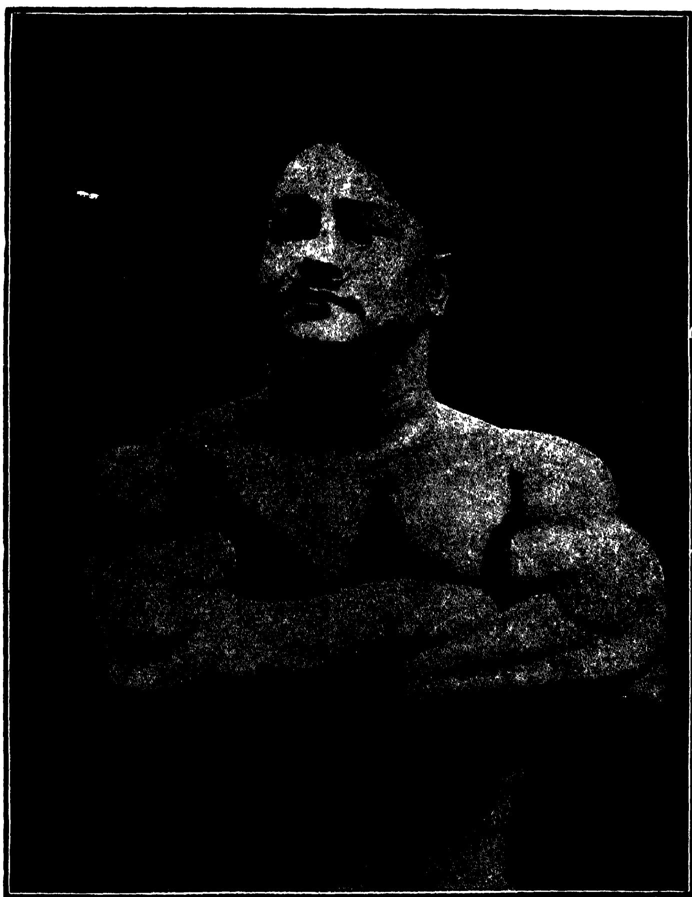
(৬) আলা বক্স।

(৭) সাহাবুদ্দিন।

(৮) গণ্ডা সিং।

(৯) গোবরবাবু (পৃথিবীর লাইট-হেভি ওয়েট্ চ্যাম্পিয়ন)

ভারতবর্ষে গোবরবাবুই একমাত্র পালোয়ান যিনি পাশ্চাত্য কুস্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।



ফণীন্দ্রকৃষ্ণ

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ একাধারে ডাক্তার ও ব্যায়াম-বীর। তাঁহার পুরো নাম ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত আই-এম-এস্ (অবসর প্রাপ্ত)। ক্যাপ্টেন খেতাবটি তাঁহার ডাক্তারির কৃতিত্বের নিদর্শন। ফণীন্দ্রকৃষ্ণই আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যায়ামচর্চ্চা প্রচলন করেন এবং কেবল মাত্র ব্যায়াম-চর্চ্চা দ্বারা নানারূপ জটিল ব্যাধি আরোগ্য করিবার বিবিধ নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন।

১৮৮৩ সালে কলিকাতা শহরে ফণীন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺গোঁসাইদাস গুপ্ত। ইনি অতি ক্ষীণদেহ ও দুর্ব্বল ছিলেন। বাঙ্‌লার সুনামখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ফণীন্দ্রকৃষ্ণের মাতামহ ছিলেন।

হুগলী জেলার বালীতে ইঁহাদের পৈতৃক নিবাস ছিল। কিন্তু এক শত বছর যাবৎ কলিকাতা শহরেই বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

কলিকাতায়ই ফণীন্দ্রকৃষ্ণের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং এখানেই তাঁহার শিক্ষার শেষ হয়। তিনি প্রথমে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি হইলেন। স্কুলের পড়া শেষ করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজে কিছুকাল পড়েন। তারপর সেখান হইতে আবার সেণ্ট্রাল কলেজে গিয়া ভর্তি হইলেন। কলেজের সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ১৯০৮ সালে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ হইয়া বাহির হন।

তিনি শরীর ভাল করিবার জন্য অম্বুবাবুর আখড়ায় ভর্তি হইলেন। ফণীন্দ্রকৃষ্ণ সাত বছর অম্বুবাবুর আখড়ায় কুস্তি লড়েন। প্রত্যহ ভোরে কুস্তি লড়িতেন এবং বিকালবেলা ডাম্বেল প্রভৃতির ব্যায়ামাদি করিতেন। অম্বুবাবুর মৃত্যুর পর ফণীন্দ্রকৃষ্ণ নিজের বাড়ীর নিকটেই একটি আখ্ড়া খোলেন। এখানে বাঙালী ও পশ্চিমদেশীয় যুবকদিগকে কুস্তি শিখাইতেন।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতাতেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করেন। এই সময়ে তিনি কিছুকাল জাহাজের সার্জ্জন হইয়া চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া আসেন। ১৯১৪ সালে যখন য়ুরোপের মহাসমর আরম্ভ হয় তখন তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে ঢুকেন। এই সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও ডাঃ সর্ব্বাধিকারীর চেষ্টায় বেঙ্গল এম্বুল্যান্স কোর নামক একটি

বাঙালী স্বেচ্ছা-সেবক-দল যুদ্ধের জন্য গঠিত হয়; ইহার গঠন-কার্যে ফণীন্দ্রকৃষ্ণ যথেষ্ট সহায়তা করেন এবং ইঁহাদিগকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দিয়া ইহাদের সহকারী নায়ক (Adjutant) হইয়া মেসোপটেমিয়া যান। এই দলের সকলেই শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের সন্তান। ইহারা ফণীন্দ্রকৃষ্ণের অধিনায়কত্বে খুব সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন। যখন এই দল ভাঙ্গিয়া যায়, তখন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ ঈজিপ্ট (মিশর), প্যালেস্টাইন, তুর্কী, সিরিয়া, আর্ম্মেনিয়া, আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন।

ভারতীয় সেনা-দলে কাজ করিবার সময় তিনি ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেণ্টের নামজাদা পালোয়ানদিগকে কুস্তি শিখাইতেন। মাঝে মাঝে প্রধান সেনাপতির আদেশে কুস্তির প্রতিযোগিতায় বিচারক থাকিতেন।

প্রায় নয় বৎসর তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। এখন তিনি কলিকাতায়ই থাকেন। তাঁহার উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম-প্রণালী শিক্ষা দিয়া বাঙ্লার দুর্ব্বল ও শ্রী-হীন তরুণদিগকে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ করিয়া তুলিবার সাধনাই এখন তাঁহার জীবনের কাজ। তিনি ব্যায়াম-শিক্ষার ভিতর দিয়া চিকিৎসা করিয়া অনেক কঠিন রোগীরও আরোগ্য বিধান করিয়াছেন। তিন বছর যাবত তিনি এইভাবে বাঙালী অবাঙালী বহু রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতায় যখন কুস্তির প্রতিযোগিতা হয়, অনেক সময় ফণীন্দ্রকৃষ্ণই বিচারক থাকেন এবং তাঁহার বিচার সকল পক্ষই মাথা পাতিয়া লন। ১৯২৩-২৪ সালের কলিকাতা প্রদর্শনীতে যে নিখিল-ভারত কুস্তির প্রতিযোগিতা (All India Championship Wrestling Tournament) হয়, তাহাতে ফণীন্দ্রকৃষ্ণ ও মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেব মধ্যস্থ ছিলেন।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ দুই প্যাকেট খেলিবার তাস এক সঙ্গে একটানে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারেন।

ইনি চব্বিশ বছরের সময় বিবাহ করেন। ফণীন্দ্রকৃষ্ণের শরীরের পরিমাণ এইরূপ :—

ওজন — ২ মণ ১৫ সের

উচ্চতা — ৫ ফিট্ ৫ ইঞ্চি

বুক — ৪৭ ইঞ্চি (স্ফীত ৪৯½ ইঞ্চি)

বাহু (Bicep) — ১৮ ইঞ্চি (৫ ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চতায় ১৮ ইঞ্চি বাহু আর কাহারো নাই (World's record)

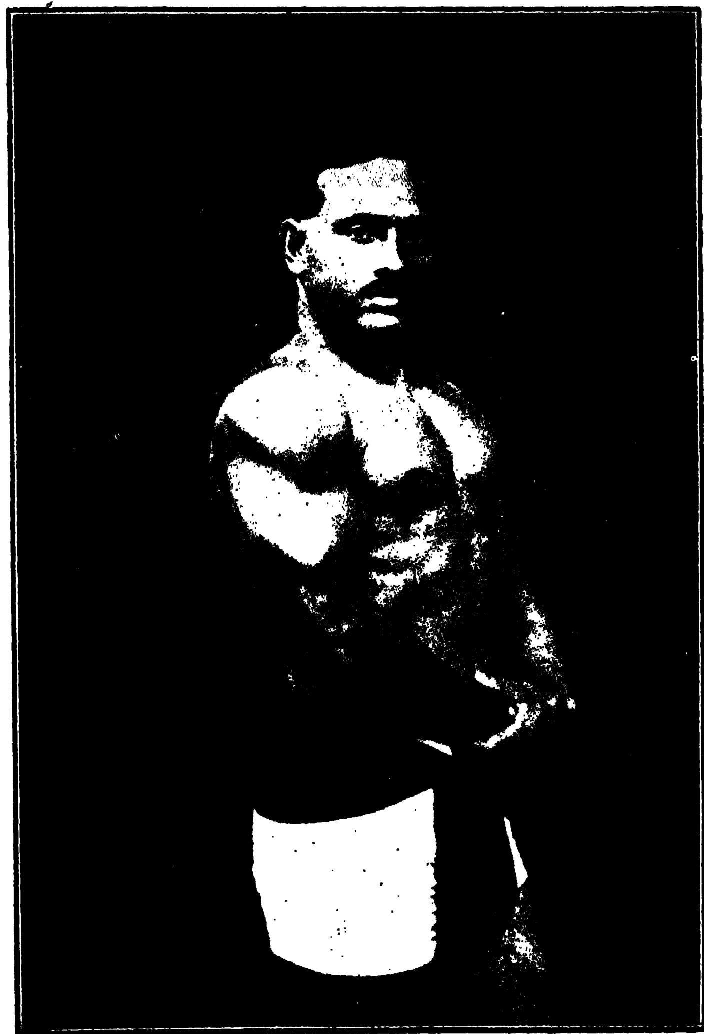
প্রকোবাহু — ১৪ ইঞ্চি

ঊরু — ২৬½ ইঞ্চি

কোমর — ৩৩ ইঞ্চি

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ অতিরিক্ত আহারের বিরোধী।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ একদল সবল ও কর্ম্মঠ বাঙালী যুবক গড়িয়া তুলিয়াছেন।



রাজেন ঠাকুরতা

রাজেন ঠাকুরতা

কলিকাতার সিটি কলেজ ও য়ুনিভারসিটি ল্ কলেজ হোস্টেলের ব্যায়াম-শিক্ষক প্রফেসার রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতার নাম আজ সুপরিচিত। একদিন রাজেনবাবু বড় ক্ষোভে ব্যায়াম-বীর রামমূর্ত্তিকে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার বাঙ্‌লা থেকে অন্ততঃ একশো রামমূর্ত্তি বের করে দেবো।" আজ তাঁহার সেই শপথ-বাণী সত্য হইতে চলিয়াছে। এমন ডজন কয়েক রামমূর্ত্তি ইহারই মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে।

১২৯০ সালে মাঘ মাসে বরিশাল শহরে মামাবাড়ীতে রাজেন বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার বাবার নাম ৺বসন্তকুমার গুহ ঠাকুরতা। ইঁহাদের বাড়ী বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামে। রাজেন বাবুর বাবা খুব বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন।

রাজেন বাবুর বয়স যখন মোটে আড়াই বছর তখন তাঁহার মা বাপ উভয়েই মারা যান। তখন হইতেই রাজেনবাবু মামাবাড়ীতে প্রতিপালিত।

রাজেন ঠাকুরতা

ছোটকালে রাজেনবাবুর লিভার খারাপ ছিল, প্রায়ই অসুখে ভুগিতেন। একবার নিউমোনিয়ায় একেবারে মরার মত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রাজেন বাবুর বয়স যখন মোটে ছয় বছর তখনই তিনি বেশ ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন। তের চৌদ্দ বছর পর্যান্ত তিনি ঘোড়দৌড় অভ্যাস করেন। বার বছর বয়স হইতেই ডন-কস্‌রত করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁহার খুব জেদ ছিল— রাগও ছিল ভয়ানক। যখন যাহা করিবেন বলিয়া ধরিয়া বসিতেন, তাহা নাছোর-বান্দা হইয়া ধরিয়া থাকিতেন, শেষ করিয়া তবে ছাড়িতেন। তাঁহার ডর-ভয় মোটেই ছিল না। একবার বাড়ীতে কি লইয়া রাগারাগি হয়, তিনি বাড়ী ছাড়িয়া পালাইলেন। তারপর এক সার্কাস-দলে গিয়া নাম লিখাইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র বার বছর এবং বরিশাল বি. এম্. স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন। তখন হইতেই তাঁহার পড়াশুনা ক্ষান্ত হয়।

এই সময় বরিশাল বি. এম্. স্কুলে ব্যায়াম মাষ্টার ছিলেন। মল্লবীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য শিষ্য সূর্য্যকান্ত গুহ ঠাকুরতা। সূর্য্যবাবু রাজেন বাবুকে বড় ভালবাসিতেন। তখন রাজেনবাবুর বয়স চৌদ্দ বছর। সূর্য্যবাবু রাজেনবাবুকে জোর করিয়া ব্যায়ামে প্রবৃত্ত করান। রাজেনবাবু সার্কাসের কসরত শিখিবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসেন। সূর্য্যবাবু যত্ন করিয়া তাঁহাকে জিমনাষ্টিকের সব রকম কৌশল (figure) শিখাইয়া

দিলেন। রাজেনবাবুর শারীরিক গঠন স্বভাবতঃই বেশ ভাল ছিল। ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে তাঁহার শরীরটি দিন দিন বড়ই সুন্দর হইয়া উঠিল।

রাজেনবাবুর মামা কিন্তু ব্যায়াম-ট্যায়াম দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। রাজেনবাবু যে ব্যায়াম করে, ইহা মামার জানিতে পারিলে আর রক্ষা ছিল না। বাধ্য হইয়া রাজেনবাবুকে লুকাইয়া-পালাইয়া ব্যায়াম করিতে হইত। তিনি অনেক মারপিট খাইয়াও কোন দিন ব্যায়াম ছাড়েন নাই। এতখানি ঐকান্তিকতা ছিল তাই আজ তিনি এত বড় হইতে পারিয়াছেন!

সূর্য্যবাবুর নিকট তিন জন শিখ সৈন্য ডন-কসরৎ করিতে আসিত। উহাদের মধ্যে একজন পাঁচ মণ ওজনের একটি পাথর বুকে লইয়া তাহার উপর আবার মানুষ উঠাইত। দেখিয়া রাজেনবাবুর তরুণ হৃদয়ের রক্তবিন্দুগুলি নাচিয়া নাচিয়া উঠিল। ভাবিলেন, শিখে যাহা করিতে পারে বাঙালীও তাহা অবশ্য পারিবে। তিনি সূর্য্যবাবুকে বলিলেন, আমি বুকে পাথর লইব। সূর্য্যবাবু তো কিছুতেই দিবেন না। রাজেনবাবু কোন আপত্তিই শুনিলেন না। বাধ্য হইয়া সূর্য্যবাবু অনুমতি দিলেন। রাজেনবাবু পাঁচ মণ ওজনের পাথরখানি বুকে তুলিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন। এই সফলতায় তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিল এবং মনের জোরও বাড়িয়া গেল। তিনি আরও ভারী পাথর উঠাইতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ চেষ্টা করিয়া

তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই নয় দশ মণ ওজনের পাথর বুকে লইতে সক্ষম হইলেন। তখন ১৯১০ সাল।

১৯১০ সালে বরিশাল শহরে দরবার দিন উপলক্ষে শারীর-চর্চা লইয়া বি-এম্ কলেজ ও জিলা স্কুলের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হয়।

তিনি সে দিন সকলের সাম্‌নে বুকের উপর রোলার, তার উপর পাঁচ মণ ওজনের একখানি পাথর এবং তার উপর চারিজন লোক লইলেন। উপস্থিত দর্শকগণ বিস্ময়ে ও আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাজেনবাবুর খুব প্রশংসা করিলেন।

ইহার পর হইতে রাজেনবাবুর মনের জোর খুব বাড়িয়া যায়। পর বৎসর দরবার দিনে তিনি একটন (২৭॥ মণ) ওজনের রোলার বুকে লন। প্রত্যেক বারেই বরিশাল কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয় তাঁহাকে মেডেল ও অন্যান্য পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতেন। বরিশালে তিনি পরিশেষে আড়াই টন (৬৮ মণ ৩০ সের) ওজনের রোলার বুকে লইতেন।

১৯১৪ সালে রাজেনবাবু একটি সখের সার্কাসদল (amateur circus party) গঠিত করেন। ১৯১৬ সালে তিনি ভজহরি দে নামক একজন সঙ্গীকে লইয়া ঢাকায় আর্মানীটোলা বায়স্কোপ হলে প্রথম টিকিট করিয়া সার্কাস দেখান। ইহাতে তিনি রোলার বুকে লন, শিকল ছিঁড়েন এবং ভজহরি ৪৫ মিনিট

মাটির নীচে থাকেন। ঐ বছর ঢাকাতেই ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নীর বিদায় উপলক্ষে তিনি মোটরগাড়ী থামান।

ছয় মাস ঢাকায় থাকিয়া মৈমনসিংহ মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুরের বাড়ীতে মোটর থামান এবং রোলার বুকে লন।

এই সময়ে রাজেনবাবু নারায়ণগঞ্জে সাড়ে তিন টন ওজনের একটি রোলার বুকে লইয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতা যান। সেখানে কার্লেকার সার্কাসে তিনি চারি টন (১১০ মণ) ওজনের রোলার বুকে লন।

ইহার পর বৎসর তিনি অলডার্স সার্কাসে খাতা লওয়া অভ্যাস করেন। ১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার দম গ্রামে রায় বাহাদুর গোলকচন্দ্রের বাড়ীতে একটা হাতীকে এক দিনের ভিতর শিক্ষিত করিয়া সেটাকে বুকে লন।

১৯১৯ সালে প্রোফেসর রামমূর্ত্তি খেলা দেখাইতে বরিশাল যান। রাজেনবাবু সেই সময়ে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে, রামমূর্ত্তির সবগুলি খেলাই তিনি দেখাইবেন। রামমূর্ত্তি রাজী হন এবং রাজেনবাবুকে তাঁহার খেলার জিনিষপত্র দিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু দুই তিন দিন পরে তিনি রাজেনবাবুকে তাঁহার জিনিষপত্র (instruments) দিতে নারাজ হন। ইহাতে রাজেনবাবু খুব চটিয়া যান এবং তাঁহাকে সগর্ব্বে বলিয়া দিলেন তিনি জীবনে অন্ততঃ একশত রামমূর্ত্তি গড়িয়া যাইবেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর রাজেনবাবু একটি গরুর গাড়ী বুকে লইবার সময় হঠাৎ তাঁহার বুকে একটা আঘাত পান এবং কিছুদিন বিশ্রাম লইবার জন্য কলিকাতা যান।

একদিন কলিকাতার সিটি কলেজের অধ্যাপক ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্জির সহিত তাঁহার দেখা হয়। সতীশবাবু পূর্বে বরিশাল কলেজে প্রোফেসার ছিলেন এবং তখন হইতেই রাজেনবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয়। সতীশবাবু রাজেনবাবুকে পাইয়া বলিলেন, "রাজেন, তোমাকে সিটি কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক (Physical Instructor) হইতে হইবে।" রাজেন বাবুর ছোটকাল হইতে চাকুরী করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সতীশবাবু বলিলেন—"রাজেন, শুধু নিজের শরীর বড় করিলেই চলিবেনা না, সঙ্গে সঙ্গে আরো দশজনের শরীরও ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাঙালী শরীর হিসাবে বড় দুর্বল। বাঙালীকে সবল করিয়া তুলিবার ভার তোমাদিগকেই নিতে হইবে।" তখন তাঁহার মনে হইল রামমূর্তির কাছে তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা। ভাবিলেন, এই তো সুযোগ। স্কুল কলেজের ভিতর দিয়াই তো বাঙালীকে সবল করিবার মন্ত্র প্রচার করিতে হইবে।

১৯২০ সালের জুলাই মাসে তিনি চাকুরী গ্রহণ করিলেন। এই বছর সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি কলিকাতায় শরীর-চর্চা প্রদর্শন করেন। এই উপলক্ষে তিনি মোটর থামান, রোলার বুকে লন এবং বারের (Bar) নানারকম কসরৎ দেখান।

রাজেনবাবু ইহারই মধ্যে একদল শক্তিশালী তরুণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইঁহারা দেশের গৌরবস্বরূপ। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান গোপালচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী তিনখানা মোটর থামাইতে পারেন, শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী দুইটন রোলার বুকে লন, শ্রীমান বিষ্ণুচরণ ঘোষ muscle controlএ (মাংসপেশীর স্বেচ্ছানুরূপ সঞ্চালনে) পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, শ্রীমান হীরেন্দ্র নাথ দত্ত motor accidentএ (দূর হইতে force দিয়া মোটর খানিকে গায়ের উপর দিয়া চালাইয়া লইতে দেওয়া) এবং motor brushingএ (দুই ধারে দুই খানি মোটর push করিয়া ঠেলিয়া দেওয়া) খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, শ্রীমান শৈলেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমান গোপাল চৌধুরী, শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্র রায়, শ্রীমান সত্যপদ ভট্টাচার্য্য weight-lifting এ (ভার-উত্তোলন) এবং শ্রীমান কেশবচন্দ্র সেন muscle control ও bar-bending (লৌহদণ্ড ধনুকের ন্যায় নত করা) বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন।

রাজেনবাবু কলিকাতায় একটা নূতন উদ্যম ও প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙালীকে শরীরের দিক্ দিয়া সবল ও সমর্থ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য "All Bengal Physical Culture Association" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের গণ্যমান্য অনেকেই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং যাঁহারা শরীরচর্চ্চায় বাঙলায় অগ্রণী সেই রাজেনবাবু, গোবরবাবু, ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ, পুলিনবাবু প্রভৃতি ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত রহিয়াছেন।

রাজেন ঠাকুরতা

রাজেনবাবু ১৯২৫ সাল হইতে কলিকাতার "ল্" কলেজের ছাত্রাবাস হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে সেখানে একটি চমৎকার ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রাজেনবাবু নিরামিষাশী। মাছ মাংস তিনি বিশেষ পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, নিরামিষ আহারেই শরীর ভাল থাকে, অসুখ-বিসুখও কম হয়। খাওয়ার বিষয়ে তিনি বিশেষ সংযমী—খুব অল্প আহার করেন। তিনি বলেন, সাধারণ বাঙালীর যা খাদ্য তাহাতেই শরীর বেশ ভাল হইতে পারে। পেস্তা-বাদাম মাংস-পোলাওর কোন দরকার পড়ে না। তিনি পোষা-শরীর—যে শরীর সবল ও সুন্দর করিয়া তৈরী হয় শুধু লোক দেখানোর জন্য,—সে শরীর মোটেই পছন্দ করেন না। শরীর যদি সৎকাজেই না লাগিল সে শরীর থাকা না থাকায় কোন তফাৎ নাই। তিনি অনেক দিন হইতেই ছাত্রদের সহিত মিশিতেছেন, ছাত্রদের ভাল-মন্দ কিসে হয় তিনি তাহা ভাল করিয়াই বোঝেন। তিনি বলেন—যে কোন ব্যায়াম নিয়মিত ভাবে করিতে পারিলেই শরীর ভাল হয়। সংযম-শিক্ষা ও ব্যায়াম-চর্চ্চা পরস্পর একটি আর একটির উপর নির্ভর করে। শরীর-চর্চ্চা হঠযোগেরই একটা অংশ। ইহাও সাধনার মত করিয়াই করিতে হয়।



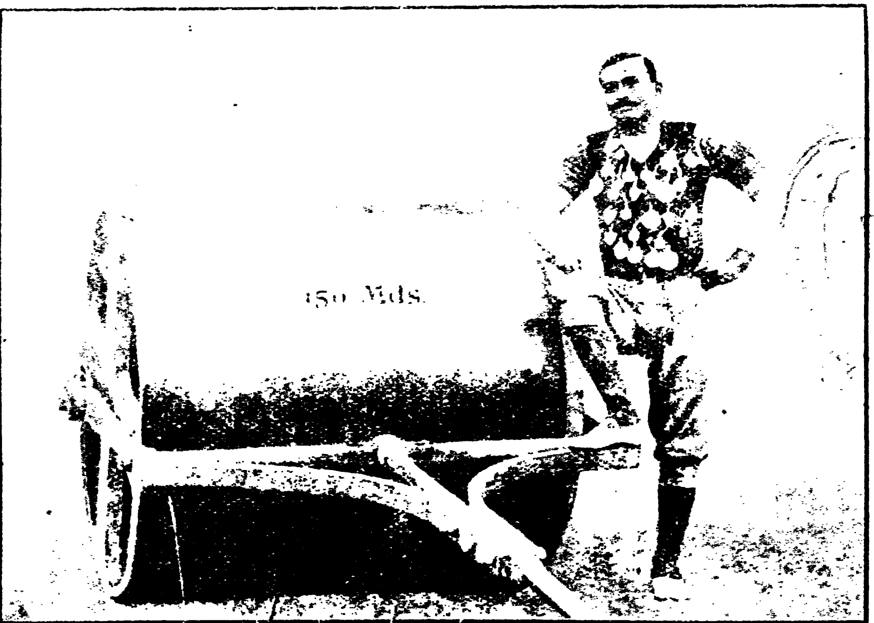
মহেন্দ্রনাথ

মহেন্দ্রনাথ

সার্কাস-বিখ্যাত মহেন্দ্রনাথের নাম বাঙলা ছেলে-বুড়ো সকলের নিকটই পরিচিত। মহেন্দ্রনাথ নিজের জীবন-সাধনা দিয়া বাঙ্‌লা দেশে একটা নূতন উদ্যম ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছেন।

১২৮৫ সালে ২রা জ্যৈষ্ঠ ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ময়নাগ্রামে মহেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুরা নাম বাবু মহেন্দ্রনাথ দাশ মজুমদার। মহেন্দ্রনাথের বাবার নাম ৺ভগবানচন্দ্র দাশ মজুমদার। ছোটকালে মহেন্দ্রনাথ বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পড়িতেন। যখন তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন সেই সময়ে তাঁহার বাবা মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর অর্থাভাবে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পড়াশুনায় ক্ষান্ত হইতে হয়। তখন তিনি চাকুরীর জন্য চেষ্টা




150 Mds.

করিতে থাকেন এবং কিছুকাল ফৌজদারী আদালতে নকল-নবিশের কাজ করেন। কিন্তু তিনি অন্য ধাতের মানুষ ছিলেন। কলম পেষা তাঁহার পোষাইল না। তিনি রঙ্গপুরে গেলেন—অন্য কোন কাজ পান কিনা। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও কোথাও দশ পনর টাকার চাকুরীও মিলিল না।

তখন তিনি ব্যায়াম-চর্চ্চায় মন দিলেন—নানা জায়গায় ঘুরিয়া ব্যায়াম শিখিলেন। কিছুদিন ব্যায়ামের মাষ্টারিও করিলেন।

ইহার পর তিনি সুবিখ্যাত এবেল সাহেবের গ্রেট্ ইষ্টার্ণ সার্কাসে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন-চিত্তটি বেশী দিন পরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকিতে চাহিল না। কিছুদিন এই সার্কাসে কাজ করিবার পর তিনি নিজেই একটি ক্ষুদ্র সার্কাস দল খুলিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহার বিখ্যাত 'রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের' বাল্যাবস্থা।

যে মহেন্দ্রনাথ একদিন আট দশ টাকার চাকুরীর জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিয়াছেন, তিনি স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় বলে প্রচুর অর্থ, সম্মান, খ্যাতি সকলই পাইয়াছেন এবং স্বর্ণ পদকাদিতে শোভিত হইয়া জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

একদিন স্বর্গীয় পরেশনাথের সঙ্গে প্রোঃ রামমূর্ত্তি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কথায় কথায় রামমূর্ত্তি একটু টিটকারী করিয়া বলিয়াছিলেন—বাঙলা দেশে কিছুই নাই। শরীর চর্চ্চার নূতন

কিছু দেখানো বাঙালী বাবুর কাজ নয়। কথায় বলে—'সাড়া রাঙা কেশ, তিন বাংলা দেশ।' জাতির প্রতি ব্যঙ্গোক্তিতে অভিমানী পরেশনাথের শরীর জ্বলিয়া গেল। তিনি মহেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া প্রোঃ রামমূর্ত্তির কথা শুনাইয়া বলিলেন,—মহেন্দ্র একটা নূতন কিছু খেল দেখি, যাতে বাঙালীর মানটা বজায় থাকে।

মহেন্দ্রনাথ, পরেশনাথের আখড়ার মাটি গায়ে মাখিয়াছেন। তিনি পরেশনাথকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি সংকল্প করিলেন, একটা নূতন কিছু করিবেনই। রামমূর্ত্তি তখন বুকে হাতী লইতেন। একদিন মহেন্দ্রনাথ রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একটা বিপুলাকার লোহার রোলার তাঁহার নজরে পড়িল। অমনি তাঁহার খেয়াল চাপিল,—১৬২ মণ ওজনের এই লোহার রোলারটি বুকে তুলিয়া লইবেন। যেমনি সঙ্কল্প তেমনি কাজ। সেই রাত্রেই কয়েকজন সহকর্ম্মীর সাহায্যে এই রোলারটা বুকে লইলেন এবং দিন কয়েকের মধ্যেই খেলা দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

মহেন্দ্রনাথের অন্যান্য খেলায়ও তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বুকের উপর বিশ মণ ওজনের একখানি পাথর তুলিয়া লন। সেই পাথর খানির উপরে একটি দণ্ডের মাথায় "রাধাচক্রে" ৪।৫ জন লোক কয়েক মিনিট ঘুরিতে থাকে। তারপর রাধাচক্রটি নামাইয়া লইলে তিনি নিজেই সেই পাথরখানি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠেন।



মহেন্দ্রনাথ

শুইয়া থাকিয়া ৭ মণ পাথর দুই হাতে অনায়াসে তুলিয়াছেন



মহেন্দ্রনাথ

২৫ হইতে ৪০ ফুট লম্বা আর ১৫ হইতে ২১ ফিট উঁচু স্থান মোটর সহ লাফ দিয়া পার হইতেছেন

মহেন্দ্রনাথ ভার-উত্তোলনেও অদ্বিতীয়। তিনি কতকগুলি লোহার গোলা লইয়া এই খেলা দেখান। এক মণ ওজনের একটি গোলা তিনি অনায়াসে চিবুকের উপর রাখিতে পারেন এবং যে কোন হাতে এই গোলাটি দশ বার হাত দূরে এবং চারি পাঁচ হাত ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে পারেন। পাঁচ মণ ওজনের গোলা দুই হাতে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া রাখিতে পারেন এবং মাথার উপর দিয়া চারি পাঁচ হাত দূরে পশ্চাৎদিকে নিক্ষেপ করিতে পারেন।

মহেন্দ্রনাথের আর একটি খেলা মোটর টানিয়া রাখা। তিনি একযোগে পঁচিশ অশ্বশক্তির সমতুল্য দুইখানি মোটর টানিয়া রাখিতে পারেন, একখানার তো কথাই নাই। মোটর গাড়ী দুইখানা মোটা দড়ি দিয়া তাঁহার দুই হাতের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর তিনি ঠিকমত দাঁড়াইলেই মোটর দুইখানি দুইদিকে পূর্ণবেগে চালাইয়া দেওয়া হয়। মহেন্দ্রনাথের বাহুবলের নিকট মোটরের গতিবেগ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। 'মোটর জাম্প' (Motor Jump) মহেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নূতন খেলা। একখানি চলন্ত মোটর লইয়া অবলীলাক্রমে ২৫ ফিট হইতে ৪০ ফিট (দৈর্ঘ্যে) জায়গা ১৫ ফিট হইতে ২১ ফিট উচ্চে লাফ দিয়া পার হইয়া যান। ইহা তাঁহার অসামান্য সাহস ও ক্ষিপ্রতারও যথেষ্ট পরিচয়। বস্তুতঃ এরূপ অমানুষিক ক্রীড়া এ পর্য্যন্ত জগতে আর কেহ খেলেন নাই।

ধনুর্বিবদ্যায় মহেন্দ্রনাথ এ যুগের সব্যসাচী। তাঁহার 'শব্দভেদীবাণ' 'সপ্ততালভেদ' প্রভৃতি খেলা আমাদিগকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়া দিত। এই তীরের খেলা মহেন্দ্রনাথের নিজস্ব। তিনি একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাসের বলে এই খেলায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। একবার মান্দ্রাজের একটি লোক আসিয়া নানারকম তীরের খেলা দেখাইয়া সকলকে বিস্ময়ান্বিত করেন। মহেন্দ্রনাথ তাহাকে ওস্তাদ মানিয়া তাহার খেলা শিখিতে চান। কিন্তু ব্যবসায়ী সুচতুর মান্দ্রাজীটি টালবাহানা করিয়া তাহাকে শিখিবার সুযোগ দেন না। ইহাতে অভিমানী মহেন্দ্রনাথ বড়ই ক্ষুব্ধ হন এবং নিজেই ধনুক লইয়া অভ্যাস করিতে থাকেন। বর্তমান যুগের বাঙালী একলব্যের এই সাধনা ব্যর্থ হইল না। কালে তিনি একজন সুনিপুণ ধনুর্বিবদ হইয়া উঠিলেন। ঐকান্তিক একাগ্রতা ও অধ্যবসায় মহেন্দ্রনাথের অতি মাত্রায় ছিল বলিয়াই তিনি আচার্য্যের বিনা সাহায্যে এই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন বিদ্যার অনুশীলনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন।

একবার মহেন্দ্রনাথ জামালগঞ্জ ও পার্ব্বতীপুর স্টেশনের মধ্যস্থানে কোন এক মেলায় খেলা দেখাইতেছিলেন। ঐ মেলার নিকটেই একটি নদী। কোন জমিদারের মাহুত একটা পাগলা প্রকাণ্ড হাতীকে রোজ তাঁহার তাঁবুর সামনে দিয়া নদীতে লইয়া যাইত। যাইবার সময় হাতীটা তাঁবুর অনেক অনিষ্ট করিত। মহেন্দ্রনাথ নিষেধ করিলেও মাহুতটা তাহাতে কান দিত না।

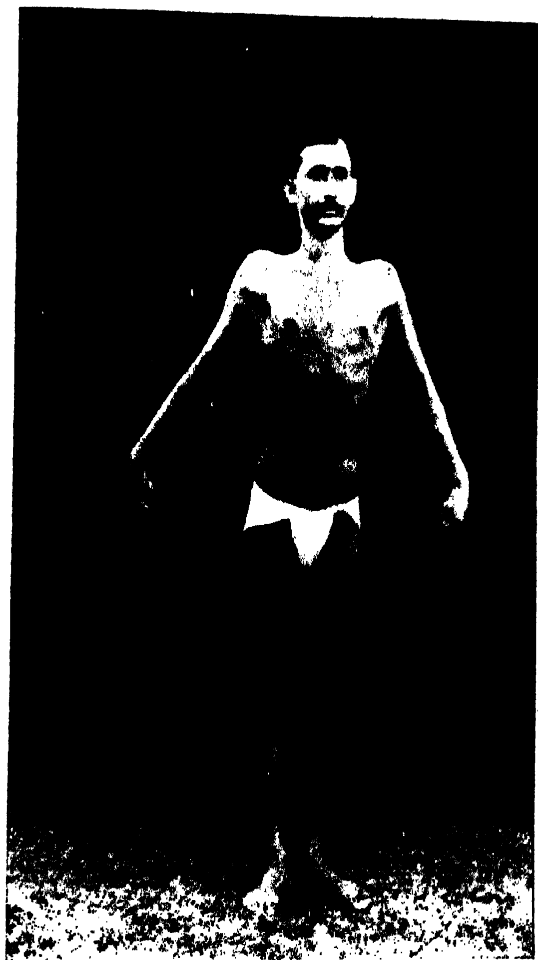
একদিন বাঁধা দেওয়ায় পাগলা হাতীটা মহেন্দ্রনাথকে হঠাৎ আক্রমণ করে। মহেন্দ্র পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার লোক নন। তিনি একটা মোটা বাঁশ লইয়া হাতীটাকে বেদম পিটাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় আধঘণ্টা মার খাইয়া হাতীটা চীৎকার করিয়া পালাইয়া যায়।

মহেন্দ্রনাথ নিজের-হাতে-গড়া মানুষ। তিনি বলিতেন—বাঙালী যুবকদের ভিতর মনের বল, একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস আনা চাই। তবেই তাহারা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

খাদ্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—আমরা সাধারণ বাঙালীরা যাহা খাইয়া থাকি তাহা নিয়মিত ভাবে বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে ও নিয়মিত পরিশ্রম করিলে ইহাতেই যথেষ্ট শক্তি বাড়িতে পারে। দেশী ডন-কস্‌রত—মুগুরভাজা, বুকডন প্রভৃতিই ভাল। কিন্তু মিতাচারী ও মিতাহারী না হইলে শক্তি-সঞ্চয় অসম্ভব।

তিনি আরো বলিতেন,—যুবকগণ যদি পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন এবং সমগ্র জীবন সংযমে পরিচালিত **করেন,** তবে শরীরে অমানুষিক বল পাইবেন।

বড়ই দুঃখের কথা, ১৩৩৭ সালে মহেন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা জয়যুক্ত হউক। বাঙ্‌লায় আবার দলে দলে ছেলেদের ভিতর সংহত-ভাবে ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রচলিত হউক। তাহারা বজ্রকঠোর শক্ত-সমর্থ মানুষ হইয়া দাঁড়াক।



শ্যামসুন্দর গোস্বামী

(ব্যায়াম-চর্চ্চার পূর্ব্বে)



শ্যামসুন্দর গোস্বামী

(ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে)

শ্যামসুন্দর গোস্বামী

যে পুণ্যতীর্থ শান্তিপুর ভক্ত বৈষ্ণবদের পূত প্রেমধারায় বহু শতাব্দী ধরিয়া প্লাবমান রহিয়াছে, সেই শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশে ব্যায়ামাচার্য্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী মহাশয়ের জন্ম হয়। ক্ষত্রোচিত সাধনা ভাবগ্রাহী বাঙালীকে কর্ম্মঠ মানুষ করিবার সাধনা। বস্তুতঃ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত ব্যায়াম-প্রণালী সাহায্যে বাঙালীকে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়া থাকিবার পথ করিয়া লইতে হইবে। এই পথে যাঁহারা দীপবর্ত্তিকা হস্তে জাতিকে পথ প্রদর্শন করিয়া চালিত করিতেছেন তাঁহাদের অন্যতম শ্যামসুন্দর।

ইংরাজী ১৮৯১ সালের ১১ই অক্টোবর (১২৯৮ সন ২৫শে আশ্বিন) রবিবার বীরাষ্টমী তিথিতে শ্যামসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুর তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতা "গোস্বামী ইনষ্টিটিউটের" প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী।

যতীন্দ্রমোহন শরীর চর্চ্চার একজন উদ্যোগী। স্বর্গীয় পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছিলেন, আমাদের জাতির ক্রমশঃ অপচীয়মান শারীরিক শক্তি যতীন্দ্রমোহনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রদিগকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শিক্ষাদ্বারা সুগঠিত করিয়া তুলিবেন। তাঁহার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে। তাই আজ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর গোস্বামী শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন যে ভার-রক্ষণে (weight supporting) তিনি জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। (—Sad Neglect of Physical Culture Among the Indians—ইংরাজীর মর্ম্মানুবাদ) বাল্যকালে শ্যামসুন্দর মোটেই বলবান ছিলেন না। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং তিনি রোগা ছিলেন। তবে ছোটকাল হইতেই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ছিল। আজ যে তিনি ভারতের নানাস্থানে শরীর ও মনের উৎকর্ষবিধায়ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্ত্তিত শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা একমাত্র তাঁহার পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল।

বর্ত্তমানে তিনি নিয়মিত ভাবে Liberty, Athletic India, Welfare, Modern Journal, Amrita Bazar Patrika, Sportsman, Tennis & Sports, আনন্দবাজার পত্রিকা,

প্রবাসী, বসুমতী, বঙ্গলক্ষ্মী, শান্তিপুর প্রভৃতি পত্রিকায় শরীর চর্চা বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।

অতুলনীয় শক্তি-অর্জনে, বজ্রবৎ শরীর-গঠনে, দুর্জয় মনন-শক্তির সংবর্দ্ধনে পিতৃদত্ত উপদেশ ও আদেশই শ্যামসুন্দরকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সহায়তা করিয়াছে। নবজীবনের প্রারম্ভেই তিনি তদীয় পিতৃদেব কর্তৃক 'মানুষ হওয়ার' মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

যে শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা তিনি শরীর-চর্চ্চাকে এক নবরূপ দিয়াছেন তাহা তদীয় তথ্য-নির্ণয়ের অক্লান্ত চেষ্টা, অবিচলিত অধ্যবসায়, গভীর গবেষণা, তুলনামূলক অধ্যয়ন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সিদ্ধান্তগুলির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও পরীক্ষা, ধীর পর্য্যবেক্ষণ, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং সর্ব্বোপরি তাহার স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতা-প্রসূত। তিনি ব্যায়ামচর্চ্চা দ্বারা যেরূপ শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, আবার উহারই সাহায্যে রোগ নিরাকরণও করিতে পারেন। এই নিমিত্ত তাঁহার ব্যায়াম চর্চ্চা দুই ভাগে বিভক্ত—(১) গঠনমূলক ও (২) আরোগ্যমূলক। তিনি বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা করিতেছেন—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সংগঠন, আয়ুবর্দ্ধন, জরানিরাকরণ, ব্যাধিনিবারণ, বলবৃদ্ধি, মেধাবৃদ্ধি, শুক্রজয়, সুন্দর সবল অপত্যোৎপাদনের উপায় ইত্যাদি।

মহীশূরের মহারাজা, নরসিংহগড়ের মহারাজা কিষেণ প্রসাদ বাহাদুর প্রমুখ ভারতের বিখ্যাত রাজন্যবর্গের সমক্ষে শ্যামসুন্দর

অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বহুমূল্য উপহার লাভ করিয়াছেন। পিঠাপুরমের (মাদ্রাজ) মহারাজার 'হীরক পদক' তিনি লাভ করিয়াছেন। হায়দরাবাদের নিজাম ক্লাবে তিনি Iron man নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নেপালের মহারাজা, পিঠাপুরমের মহারাজা, রামনাদের রাজা, নবাব সালার জঙ্গ বাহাদুর, পারলা কিমেডির রাজকুমার প্রভৃতির ভূতপূর্ব ব্যায়াম-শিক্ষক (Physical Director) ছিলেন। বাঙালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা বৈকি।

শ্যামসুন্দর ৬ টন ওজন (প্রায় ১৬২ মণ) অথবা দুইটি হাতী বুকের উপর লইতে পারেন; আধ টন ওজন গলার উপর লইয়া থাকেন; ইনি শরীরের পেশীসমূহ যথেচ্ছ সঞ্চালন ও সঙ্কোচন করিতে পারেন—পেশীসমূহ সঙ্কোচনদ্বারা এতটা শক্ত করিতে পারেন যে অত্যন্ত সবল হস্তে তীক্ষ্ণ চিমটাদ্বারা বিদ্ধ করিলেও তিনি অক্ষত ও অচঞ্চল রহেন; পেটের পেশী সঙ্কোচন করিলে জোয়ান মুষ্টিযোদ্ধা তাঁহাকে ঘুষি মারিয়া মোটেও কাবু করিতে পারেন না; তাঁহার গলায় মোটা দড়ি বা লোহার শিকল বাঁধিয়া আটজন লোক টানাটানি করিলেও তাঁহাকে ফাঁসি দিতে পারিবে না। শ্যামসুন্দর এক প্যাকেট তাস (৫২ খানা) একটানে দুই ভাগ, চারি ভাগ, আট ভাগ ও পরিশেষে ষোল ভাগে ছিন্ন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত লোহার শিকল ভাঙা, লোহার মোটা শিক বাঁকা করা, দাঁত চুল ও অঙ্গুলী দ্বারা গুরুভার উত্তোলন

করা—তাঁহার উল্লেখ-যোগ্য কসরৎ। শ্যামসুন্দরের উদ্ভাবিত বিনা অস্ত্রপ্রয়োগে বস্তি (Colon Lavage) বা অন্ত্রধৌতি (Alimentary Canal Washing) দ্বারা শরীরকে সুস্থ ও নিরাময় রাখা যায়। বিনা অস্ত্রে গুহ্যদ্বার দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করাইয়া এবং উহা দ্বারা অভ্যন্তর ভাগ ধৌত করিয়া পুনরায় সেই জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। শ্যামসুন্দর বাবুর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমান দীনবন্ধু প্রামাণিক বহু স্থানে ইহার প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ভাই শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর গোস্বামী ধনুর্বিদ্যায় ক্ষিপ্রহস্ত ও শ্রীযুক্ত নিতাইসুন্দর গোস্বামী পেশী-নিয়ন্ত্রণে সুদক্ষ।

শ্যামসুন্দরবাবু তাঁহার এই ব্যায়াম-প্রণালীদ্বারা যক্ষ্মা, অজীর্ণ, অম্ল, চক্ষুরোগ, বাত এবং বহুবিধ কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত ব্যায়াম-প্রণালী সাহায্যে বৃদ্ধও তরুণ যুবা হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

যাহাতে বাঙালী জাতি স্বাস্থ্য ও শক্তির অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে—ইহাই শ্যামসুন্দর বাবুর সকল কর্ম্ম-প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে শান্তিপুরের ব্যায়াম-শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহাতে এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তজ্জন্য তিনি জীবনপণ করিয়া ব্রতী হইয়াছেন। ইতিমধ্যে অনেক ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতী তাঁহার ব্যায়ামশালা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া

বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্যামসুন্দর বাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় এই কর্ম্ম-যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্যামসুন্দর বাবু যেমন একদিকে শরীরচর্চ্চা প্রদর্শন করিয়া দেশের বুকে প্রেরণা যোগাইতেছেন, অপরদিকে আবার গভীর গবেষণা দ্বারা জীবনের এই অতি-প্রয়োজনীয় উপকরণটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমেরিকার Natureo-pathy Association তাঁহার এই শরীর সম্বন্ধীয় গবেষণা সমর্থন করিয়াছেন।

শ্যামসুন্দরের এই প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হইয়া উঠুক। বাঙালী জাতি আবার গর্ব্বোন্নত শিরে স্বাস্থ্য ও শক্তি লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াক্।

অসি-খেলায় বাঙালী

ননীলাল

লাঠি যদিও বা তার ক্ষীণ প্রাণশক্তি লইয়া বাঁচিয়া আছে, অসির সে দর্পিত ঝনৎকার আর বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল চাহনি বাঙ্‌লাদেশে বড়-একটা দেখা যায় না। ক্ষাত্র-শক্তির মত্ত প্রতীক অসি আজ নির্ব্বাসিত, তার আশ্রয় মরচে-ধরা জীর্ণ খাপ। এমন একটা দরবারী বীরোদ্দীপক খেলা দেশে ঠাঁই পায় না!

শ্রীযুক্ত ননীলাল বসু আমাদের দেশে অসি-শিক্ষার চর্চ্চা ও প্রচার করিয়াছেন। ননীবাবু ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ কলিকাতায় অসিখেলায় একটা সাড়া আনিয়াছেন।

ননীলাল ১৮৮৭ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বেণীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালে ননীলাল পাঠশালায় পড়েন। এখানে ছাত্রবৃত্তি পর্যান্ত পড়িয়া পাশ করেন। তৎপর মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি হন। ননীলালের বয়স তখন দশ এগার বছর। এই সময়ে কালীঘাটে 'সন্তান সম্প্রদায়" নামে একটি সেবক-দল ছিল। ইঁহাদের কাজ ছিল গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করা, অসুস্থ-পীড়িতদের আপদে-বিপদে সেবা-শুশ্রূষা ও সহায়তা করা। ননীলাল এই দলে ভর্ত্তি হইয়া বিপন্ন দীন দরিদ্রের সেবা করিতেন।

এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে ননীলালের জীবনে একটি পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। ইহারই ফলে আমরা সাধারণ বাঙালী ছোক্‌রা ননীলালকে আজ অসাধারণ অসিনিপুণ দেখিবার অবসর পাইয়াছি। ননীলাল একবার এক চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক পূজার মেলা দেখিতে যান। সেই মেলায় একটা মারামারি হয়। এক বুড়ো অনেকগুলি লোককে শুধু লাঠির জোরে হঠাইয়া দিতেছিল। অথচ যাহারা মার খাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বড় বড় পালোয়ান এবং শক্ত-সমর্থ লোকও ছিল। কিন্তু মজা এই, একটি লোকের লাঠির ঘায়ে এতগুলি লোক ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছিল। দেখিয়া ননীলাল অবাক্ হইলেন, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়া পারি লাঠি শিখিবই। তারপর খুঁজিতে খুঁজিতে সেই লোকটির বাড়ী গেলেন। তাহাকে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন—"আমাকে লাঠি শিখাতে হবে।" সে বলিল—"তুই ছেলে মানুষ, তুই কি শিখ্‌বি ?"



অসি খেলায় ননীলাল

এই লোকটির নাম ছিল আব্বাস। ইহার নিকট ননীলাল কিছুকাল লাঠি শিখিলেন। তারপর বনমালী নামে একজন বাগ্দীর নিকট হইতে লাঠি শিক্ষা করেন।

এই সময়ে কলিকাতায় শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণীর বাড়ীতে বীরাষ্টমী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। ইহাই বাঙ্লা দেশে প্রথম বীরাষ্টমী উৎসব। সে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। বাঙ্লা দেশে শরীর-চর্চ্চার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া দেশের দুর্ব্বল পঙ্গু ও হতবীর্য্য তরুণদলকে স্বাস্থ্যে ও শৌর্য্যে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিবার ইহাই প্রথম সংহত প্রচেষ্টা। সেবারকার এই বীরাষ্টমী উৎসব দেখিতে ননীলাল শ্রীযুক্তা সরলাদেবীর বাড়ীতে যান। সেখানে বাঙ্লার অনেক বিখ্যাত খেলোয়ার সমবেত হন। রাজপুতনা, পঞ্জাব প্রভৃতি দেশের অনেক অসিনিপুণ এবং মল্লবীরও ইহাতে উপস্থিত হন। এই উৎসবের তলোয়ার খেলা দেখিয়া ননীলালের খুব ইচ্ছা হয়, একটু তলোয়ার ঘুরাইয়া দেখান। তখনও কিন্তু তিনি তলোয়ারের একরকম কিছুই জানেন না এবং শিখেনও নাই। কেবল লাঠি যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন তাহারই অভিজ্ঞতা ও ভরসায় তলোয়ার লইয়া খেলার আসরে নামিয়া পড়িলেন। সে সময়ে তাঁর বয়স চৌদ্দ পনর বছর। এতটুকু ছেলেকে এমন সুন্দর তলোয়ার ঘুরাইতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই খুব সন্তুষ্ট হন

এবং খুশী হইয়া তাঁহাকে একটি মেডেল পুরস্কার দেন। সেই হইতে আজ পর্যান্ত শ্রদ্ধেয়া সরলাদেবী ননীলালকে আপদে বিপদে সাহায্য করিতেছেন, যখন সকলে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে, এই বীরাঙ্গনা মাতৃমন্দিরই তাঁহাকে ও তাঁহার দলকে বুক-ভরা স্নেহ দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে। বীরাষ্টমীর এই প্রথম সফলতাই তাঁহাকে সব সময় উৎসাহের ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, তলোয়ার শিখিতেই হবে।

এই সময়ে মল্লিকলেনে ননীলাল নিজেই একটা আখড়া খোলেন। সেখানে নূতন উদ্যমে কুস্তি ও লাঠির চর্চ্চা করিতে থাকেন এবং ছোট ছোট ছেলেদিগকে শিক্ষা দিয়া ভাল কুস্তিগীর ও লাঠিয়াল করিয়া গড়িয়া তোলেন।

এই সময়ে কলিকাতা মনোহরপুকুর বাগানে শিবনারায়ণ পরমহংস বাস করিতেন। ননীলাল পরমহংসদেবের কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যান এবং সেই বাগানেই লাঠি খেলার একটি আড্ডা স্থাপন করেন। একদিন যখন ননীলাল খেলিতেছিলেন, পরমহংসদেব তাঁহার খেলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তলোয়ার খেলার কতকগুলি নূতন বিষয় শিখাইয়া দেন। এইরূপে কয়েকদিনের মধ্যে পরমহংসদেব ননীলালকে একজন পাকা তলোয়ার-খেলোয়ার করিয়া তুলেন। ননীলাল বর্ত্তমানে তলোয়ারের যে সমস্ত খেলা দেখান সে সমস্তই এই মহাপুরুষের শিক্ষার ফল।

ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বানার্জি

বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনের গোড়া পত্তন করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহারই ভাই জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরীর-চর্চ্চায় নূতন প্রেরণা দিয়াছেন। শরীর-চর্চ্চায় উৎসাহদাতারূপে বাংলা দেশে বীরকান্তি ক্যাপ্টেন বানার্জির নাম অমর হইয়া রহিবে।

ক্যাপ্টেন বানার্জি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৮৮০ সালে বিলাতে যাইয়া আইন অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৬ সালে কলিকাতা ভলান্টিয়ার রাইফেল আর্মিতে তিনি সাধারণ সৈনিক হইয়া যোগদান করেন। দু বছর পরে তিনি কালার সার্জেণ্ট (colour sergeant) পদে উন্নীত হন। ১৯১২ সালে যখন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজের সেনাদল পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি রেজি-মেণ্টাল কোয়ার্টার মাষ্টার (Regimental Quarter-master)

হন এবং বঙ্গবাহিনী (বেঙ্গল রেজিমেণ্ট) গঠনে সাহায্য করার জন্য ১৯১৯ সালে "ওয়ার ব্যাজ" প্রাপ্ত হন। ১৯২০ সালে তিনি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন।

বাল্যকাল হইতে ক্যাপ্টেন বানার্জি শরীর-চর্চ্চায় অনুরাগী ছিলেন। যেখানে যখন কোন খেলাধূলা বা ব্যায়াম-চর্চ্চা হইত, সেখানেই তাঁহার উপস্থিতি লক্ষিত হইত। তাঁহার দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ ছিল। অমন বীরকান্তি বাংলাদেশে কমই দেখা গিয়াছে। তাঁহার বলশালিতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহারই উদ্যোগে 'বেঙ্গল ফিজিকাল কালচার এসোসিয়েশন' গঠিত হয় এবং তিনি উহার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সোয়া লাখ টাকা শরীর-চর্চ্চার জন্য এই সমিতিকে দান করিবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। বাঙালীর দুর্বল স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে আর নাই। জিতেন্দ্রনাথ চিরকুমার ছিলেন।

১৯৩৫ সালে এই বীরচরিত্র বঙ্গ-মনীষী ৭৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

বক্সিংএ বাঙালী

বলাই চাটুয্যে

বলাই চাটুয্যের নাম শুনে নাই এমন ছেলে এদেশে বিরল। বলাই খেলোয়ার দলের মুকুটমণি—এমন খেলা নাই যাহাতে বলাই নাম না করিয়াছেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, দৌড়াদৌড়ি, বক্সিং (মুষ্টিযুদ্ধ) যাহা কিছু বল, সবটাতেই বলাই ওস্তাদের সেরা। এমন সব-খেলায়-ওস্তাদি অনেক দেশেই মিলে কম। বিদেশী খেলা খেলিয়া বিদেশীর সাথে টক্কর দিয়া বাঙালার শরীর চর্চ্চার নজীরখানি বলাই-ই তো জগতের বীরেন্দ্র-সভায় পেশ করিয়া বাঙালীর মান রাখিয়াছেন।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী চুঁচুড়ার নিকটস্থ ডুমুরদহ গ্রামে বলাই জন্মগ্রহণ করেন—১৯০০ সালের মার্চ্চ, বাংলা ৯ই চৈত্র মঙ্গলবারে। বলাইর বাবার নাম ৺রামলাল চট্টোপাধ্যায়। বলাই বাপের তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র।

বর্দ্ধমান জেলার বাদলা গ্রামে বলাইর মামা-বাড়ী। সেইখানে বলাইর লেখাপড়া সুরু হয়। বলাই ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বাদলা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়েন।

১৯১১ সালে বলাই কলিকাতা স্কটিশ চার্চেস্ স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন এবং এই স্কুল হইতেই ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। ১৯১৬ সাল হইতেই বলাই সমস্ত রকম খেলায় সমানভাবে যোগ দিতে সুরু করেন। এই বছরই হিন্দুস্কুলের সহিত একটি ফাইনেল খেলায় বলাই যোগ দেন। খেলার প্রতিযোগিতায় বলাই এই প্রথম যোগদান করেন। ইহার পরের বছর নিখিল ভারত স্কুল প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন এবং একটি শিল্ড ও মেডেল পুরস্কার লাভ করেন। বলাইর জীবনে এই প্রথম পুরস্কার পাওয়া। সেই বছরই তাহার যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া তাহাকে কলেজ টিমে লওয়া হয়।

১৯১৮ সালেও তিনি স্কুলের চ্যাম্পিয়নশিপ এবং Calcutta Athletic Junior Sport Championship পান। কালীঘাটের Sportএ মিঃ ডাফ্‌রেকে long jumpএ হঠাইয়া দেন। সেই হইতে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত বলাই প্রতিযোগিতায় high jump, hurdles প্রভৃতিতে championship পাইয়া আসিতেছেন।

১৯১৭ সালে তিনি Y. M. C. A. তে প্রথম ফুটবল খেলেন—কলিকাতা টিমের (Calcutta Team) বিপক্ষে।

১৯১৮ সালে এরিয়ান ক্লাবে (Aryan Club) ভর্তি হন এবং সকল অবস্থানেই (position) খেলেন।

ইহার পর হইতে বলাই মোহন বাগান ক্লাবে সেণ্টার হাফেই সাধারণতঃ খেলিয়া আসিতেছেন। গত কয় বছর যাবৎ কলিকাতায় ভারতীয় বনাম য়ুরোপীয় এবং সিভিল বনাম মিলিটারি যত খেলা হইয়াছে, প্রত্যেক খেলায়ই তিনি যোগদান করিয়াছেন। বলাই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র—বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, সিমলা, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন প্রভৃতি বড় বড় শহরে এমন কি শিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ প্রভৃতি দূরদেশেও খেলিতে গিয়াছেন। সব জায়গায়ই অজস্র প্রশংসা পাইয়াছেন।

১৯১৭ সাল হইতে তিনি হকি ও ক্রিকেট খেলা অতি সুখ্যাতির সহিত খেলিতেছেন। ক্রিকেট খেলায় bowling ও bating দুইটাতেই তিনি ওস্তাদ।

বলাই ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত সিটি এ্যাথ্লেটিক ক্লাবের (City Athletic Club) যেকোন অবস্থানে (position) হকি খেলিতেন। ১৯২১ সালে মোহনবাগান ক্লাবে তিনি ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, বাস্কেট বল, ভলি বল, দৌড়ান, লাফান (high and long jump), hurdle বহুদূরব্যাপী দৌড় প্রভৃতি সমস্ত ক্রীড়াতেই সমভাবে যোগদান করেন। বাঙ্লাদেশে বলাই-ই প্রথম ১০ মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করেন।

বলাইর দৌড়ের তালিকা :—

১০ মাইল—১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ; ½ আধ মাইল—২ মিনিট ৭ সেকেণ্ড ; ৪৪০ গজ—৫২⅘ সেকেণ্ড ; ২২০ গজ—২০⅘ সেকেণ্ড ১০০ গজ—১০⅘ সেকেণ্ড।

Hurdle race এর (বেড়া ডিঙ্গাইয়া দৌড়) তালিকা :—

২২০ গজ—২৭⅘ সেকেণ্ড। ১২০ গজ—১৬⅕ সেকেণ্ড।

হাই জাম্প (High Jump) :—৫ ফিট ৯ ইঞ্চি।

লং জাম্প (Long Jump) :—২১ ফিট ৫ ইঞ্চি।

কলিকাতা ব্যতীত দার্জ্জিলিং, কার্শিয়াং, পুণা, বোম্বাই, দিল্লী, সিমলা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে বলাই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

আত্মরক্ষার জন্য বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধের মত সহজ ও অব্যর্থ উপায় আর নাই। বিলাতী খেলার মধ্যে এমন বীরোচিত খেলা কমই আছে। মিলটন কিউব্‌স ভারতের নামকরা "মধ্য ওজনের বাহাদুর" (Middle Weight Champion)। বলাই প্রথম কয়েকদিন তাহার নিকট শিক্ষালাভ করেন (১৯২৫ সাল ১৭ই এপ্রিল)। তারপর বড় বড় বক্সারদের খেলা দেখিয়া নিজে নিজেই শিখেন। শিক্ষালাভের কিছুদিন পরেই কলিকাতা এম্পায়ার থিয়েটারে একটি য়ুরোপীয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় বক্সিং খেলেন এবং তাহাকে হারাইয়া দেন। বলাইর এই অভাবিত জয়লাভে সকলেই বিস্মিত হন এবং বলাইর জয় জয়কার পড়িয়া যায়।



বলাই চাটুজ্যে (মুষ্টিযুদ্ধে)



জগৎশীল (মুষ্টিযুদ্ধে)

ইহার পর ১৯২৫ সালে ২৫শে নবেম্বর কলিকাতা Y. M. C. A.র উদ্যোগে বাঙ্লার লাট সাহেব লর্ড লিটনের উপস্থিতিতে বলাই বক্সিং খেলেন। ১৯২৬ সালে ১৬ই জানুয়ারী শনিবার ভবানীপুর কিং কার্নিভালে বলাই সার্জেণ্ট ডে'র সহিত বক্সিং খেলেন। সার্জেণ্ট ডে ভারতের নাম-করা মুষ্টিযোদ্ধা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সার্জেণ্ট ডে বলাইর সহিত খেলায় ঘুষি সহ্য করিতে না পারায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। বলাই'এ পর্যান্ত যে কয়টি বক্সিং প্রতিযোগিতায় খেলিয়াছেন প্রায় সব কয়টিতেই তিনি জয়ী হইয়াছেন।

বলাই বলেন—"বক্সিং শিক্ষা করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। বক্সিং করিতে হইলে চোখের দৃষ্টির প্রখরতা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা এবং তৎপরতা একান্ত দরকার। মার খাইয়াও যাহাতে পিছু হঠিতে না হয় এমনতর ধৈর্য্য ও সহনশীলতা চাই।"

বলাই আমাদের মত সাধারণ ভাত তরকারীতেই পুষ্ট। তিনি নিরামিষ খাদ্যের খুব ভক্ত। দধি ও মিষ্টি তাহার বড়ই প্রিয়। বলাই কোনপ্রকার মাদকদ্রব্য স্পর্শও করেন না। এমন কি চা, পান, সিগারেট প্রভৃতি কিছুই খান না।

ছেলে বুড়া সকলকে শরীর-চর্চ্চা দ্বারা উন্নত ও বলিষ্ঠ করিয়া তোলাই বলাইর সঙ্কল্প। এই উদ্দেশ্যে তিনি উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বলাই বলেন—ব্যায়াম করলেই শরীরটা সবচেয়ে ভাল থাকে—বিশেষতঃ যারা নিরামিষ খান তাদের। শরীর সুস্থ ও সবল করতে হলে সকলের আগে তামাক পান চুরুট ছাড়তে হবে, বায়স্কোপ থিয়েটার যাওয়া বন্ধ করতে হবে। ছেলেদের পক্ষে যে কোন খেলাই ভাল, কিন্তু খেলাধূলার পর আড্ডাবাজী করাটাই ভয়ঙ্কর খারাপ। এমন ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করবে যে তোমার জন্যে জীবন দিতে পারে।

জগৎশীল

বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে যাহারা খ্যাতি ও যশ অর্জন করিয়া আত্মরক্ষার ক্ষত্রোচিত এই মহাস্ত্রটিকে বাঙ্‌লাদেশে প্রচালনের সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বলাই চাটুয্যে ও জগৎশীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলাইর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে শ্রীযুত জগৎকান্ত শীলের কথা বলিব। জগৎকান্ত সাধারণে "জগা শীল" বলিয়াই পরিচিত।

ইংরাজী ১৯০৬ সালে কলিকাতায় জগৎকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিখ্যাত-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী শীল। জগৎকান্ত কলিকাতাস্থ বঙ্গবাজার স্কুলে লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া মান্দ্রাজের Physical Training College হইতে (শরীর চর্চ্চা বিদ্যালয়) প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট লইয়া আসেন। ইনি ভারতের বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মিল্‌টন্ কিউব্‌সের নিকট মুষ্টিযুদ্ধ

শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতায় "জুনিয়ার" বা ছোট দলের মধ্যে জগৎকান্ত চৌকস (all-round) খেলোয়ার বলিয়া নাম করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে ইনি মোহনবাগান ক্লাবে ভর্তি হইয়া ঐ বছর হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যান্ত ফুটবল খেলিয়াছিলেন। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েসনের উদ্যোগে ১৯২৪ সালের ১০ মাইল দৌড় ও ১৯২৬ সালের ৫ মাইল দৌড়-প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস্, সাঁতার, দৌড়ঝাঁপ প্রভৃতি সকল খেলাতেই জগৎকান্ত সমভাবে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে যশস্বী করিয়া তুলিয়াছে।

১৯২৫ সালে কলিকাতায় প্রথম কিং কার্ণিভালে তিনি বক্সিংএ নামেন। ইহার পর হইতে কলিকাতার খুব কম প্রতিযোগিতাই তাঁহার বাদ পড়িয়াছে। মান্দ্রাজে অবস্থান কালে তিনি পনরটি বক্সিং প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি অধিকাংশেই জয়লাভ করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যান্ত তিনি ৩৫ বক্সিং যুদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ২৫টিতে তিনিই জিতিয়াছেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা পার্ল সিনেমাতে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা উইল কার্টারকে এবং ১৯৩০ সালে আমেরিকান সার্কাসে প্রসিদ্ধ ফিলিপীয় বক্সার রস কার্লোকে পরাজিত করেন।

জগৎকান্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের Playground Physical Director ছিলেন এবং অন্যান্য অনেক শরীর-চর্চ্চা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। School of Physical Culture এর তিনি অবৈতনিক পরিচালক। প্রতিষ্ঠানটি শরীর চর্চ্চায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ জগৎকান্তের শিক্ষাদানপ্রণালী বড়ই চিত্তাকর্ষক ও জনপ্রিয়। তিনিই আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় স্কুলসমূহের মধ্যে বক্সিং প্রতিযোগিতা প্রচলিত করিয়াছেন। জগৎকান্ত মধ্যমাকৃতি ও ক্ষিপ্রকৌশলী তরুণ যুবা। তাঁহার এই প্রচেষ্টা বাঙ্গালী ছেলেদের কঙ্কালসার দেহগুলিকে সুঠাম ও শক্তিমান করিয়া তুলুক।

পরেশলাল রায়

বাখরগঞ্জ জেলার লাখুটিয়া গ্রামে ইহার পৈতৃক নিবাস। ইনি বাল্যকাল হইতে ইংলণ্ডে লেখাপড়া শিখিয়াছেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করেন। বিলাতে পাঠাবস্থায় তিনি বক্সিং শিক্ষা করেন এবং স্কুলে একটি চ্যাম্পিয়ান হন। পরে কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়নশিপ্" ও "অক্সফোর্ড ব্লু" লাভ করেন। গত মহাযুদ্ধে পরেশলাল সৈন্যবিভাগে যোগ দেন এবং অল্পকাল মধ্যেই "লেফটেনাণ্ট" পদ লাভ করেন। তাঁহার ছোট ভাই ইন্দ্রলাল

রায় গত যুদ্ধের সময় উড়োজাহাজের চালক ছিলেন এবং আকাশ-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন।

পরেশলাল ১৯১৯ সালে এদেশে ফিরিয়া আসেন। "দি বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন" নামে বক্সিং প্রতিষ্ঠান তিনিই স্থাপন করেন। বাংলা দেশে সমস্ত বক্সিং প্রতিযোগিতা ইহারই নিয়মাধীন হইয়া পরিচালিত হয়। পরেশলালের শিক্ষাধীনে বহু বাঙালী যুবক বক্সিংএ কৃতী হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ বক্সার ফণীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ইঁহারই শিষ্য।

পরেশলাল সাধারণে পি. এল. রায় (P.L. Roy) নামে পরিচিত।

লাঠিখেলায় বাঙালী

বাঙালী চিরকালই লাঠিখেলায় অভ্যস্ত ছিল। কোম্পানীর আমলেও লাঠির অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। সেকালের শিক্ষিত লাঠিয়ালগণের অসীম ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা লক্ষ্য করিয়া মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারী দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ; হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গলার আব্রু পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। বদমাইস তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল, তুমি তখনকার পিনালকোড ছিলে।"

লাঠি-খেলায় বাঙালী

সেকালের ভূস্বামিগণের পাইক সর্দ্দার ও লাঠিয়ালগণের সাহস ও শৌর্য্যবীর্য্যের কীর্ত্তিকথা আজও লোকের মুখে মুখে কিংবদন্তীতে জীবিত রহিয়াছে। বিক্রমপুরের যুদ্ধের পর মানসিংহ, কেদাররায়ের রাজ্য তাঁহার প্রধান অমাত্য রঘুরামের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। রঘুরামের প্রধান সর্দ্দার রামমালিকের লাঠিখেলার অদ্ভুত নিপুণতার কাহিনী আজিও লোকে গাহিয়া থাকে—

"রামমালিকের লাঠি
রঘুরায়ের মাটী॥
উঠলে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পালায় বাঘ॥
গুলি ফিরে ঝাঁকে।
রামের লাঠির পাকে॥
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাটি॥"

এমন কত রামমালিক সেকালের বাঙলার পাড়ায় পাড়ায় বিরাজ করিত।

পুলিনবিহারী দাস

বস্তুতঃ লাঠি-খেলোয়ারের অভাব বাঙলা দেশে কোন কালেই হয় নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসই সর্ব্বপ্রথম দেশের

শিক্ষিত তরুণদের ভিতরে সংহত ভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাঠি শিখান। অন্যান্য লাঠিয়ালদিগের চেয়ে পুলিন বাবুর এই জায়গায়ই পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। বিশেষ করিয়া ছোট লাঠি আজ পর্যান্ত এমন সুন্দর নিয়মে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান করা লাঠির জন্ম-ও কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই হইয়া উঠে নাই। ইহা আমাদের বাঙ্লার গৌরবের কথা বৈ কি।

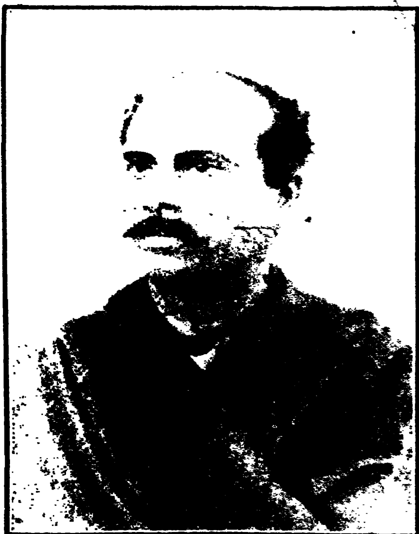
১৯০৩ সালে পুলিন বাবু প্রথম লাঠি শিক্ষা আরম্ভ করেন— একটি মুসলমান লাঠিয়ালের নিকট। কিন্তু তাহার নিকট বেশী কিছু শিখিতে পারিলেন না। ইহার কিছু পরেই লর্ড কার্জন ঢাকা আসিলে ঢাকার তৎকালীন নবাব সাহেব প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় প্রো: মার্ত্তাজাকে লাঠি খেলা দেখাইবার জন্য আনয়ন করেন। মার্ত্তাজা একজন যাদুকর ও সার্কাস-ওয়ালা ছিলেন। তিনি ঠগীদের সহিত জেলে থাকিবার সময় তাহাদের নিকট হইতে লাঠি শিখেন। ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল পি. কে. রায় মার্ত্তাজাকে একদিন কলেজে খেলা দেখাইতে বলেন। এই সময় পুলিন বাবু তাহার নিকট লাঠি শিক্ষার সুযোগ পাইলেন। অধ্যবসায়ী পুলিন বাবু মার্ত্তাজার খেলা দেখিয়া অল্প কিছু মাত্র আয়ত্ত করিতে পারিলেন। ইহার পর মার্ত্তাজা যখন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুরে থাকিতেন, তখন পুলিন বাবু তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট হইতে ধীরে ধীরে লাঠির ঘাত কৌশল শিখিয়া লন।

এই সময়ে বীরাস্টমী ও ডাঃ পি. কে. রায় মহোদয়ের বিদায়োপলক্ষে পুলিন বাবুর সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বসাধারণে তাঁহার লাঠি খেলার কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রশংসা পান। এই সময় হইতে পুলিন বাবুর নাম সকলের নিকট পরিচিত হয়। তখন পুলিন বাবু ঢাকা কলেজের লেবরেটারী-অ্যাসিষ্টাণ্টের কাজ করিতেন।

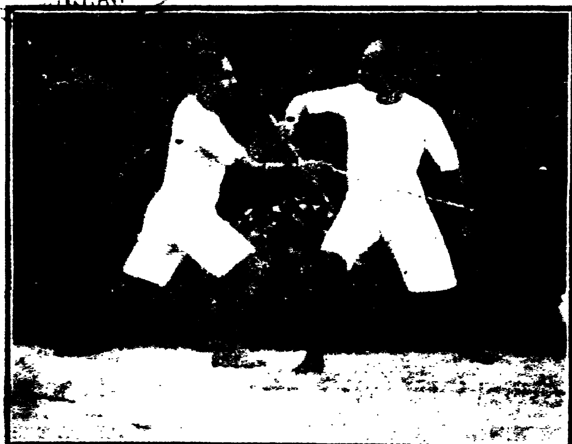
১৯০৫ সালে কলিকাতায় ব্যারিষ্টার পি. মিত্র, মনীষী বিপিন পাল প্রমুখ দেশ-নেতাদের উদ্যোগে যুবকগণের মধ্যে শরীর-চর্চ্চার আন্দোলন সৃষ্ট হইয়া উঠে, এবং নানা স্থানে ব্যায়াম-চর্চ্চার সমিতি গঠিত হয়। পুলিন বাবু তাহাদের অন্যতম পরিচালক মনোনীত হইয়া ঢাকায় আসেন।

ঢাকায় পুলিন বাবু স্বামীবাগ আশ্রমে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া যুবকদিগকে লাঠিখেলা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্র, চাকুরীজাবী, উকীল প্রভৃতি উৎসাহের সহিত লাঠি খেলা আরম্ভ করিলেন। অনধিক দুই বৎসরের নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চায় ঢাকার তরুণদলের চেহারা বদলাইয়া গেল। যাহারা অলস, দুর্ব্বল ও ভীরু বলিয়া উপহসিত হইত, তাহারা যেন যাদুস্পর্শে সুস্থ, সবল ও সাহসী হইয়া উঠিল।

এই সময়কার কৃত্রিম লাঠির লড়াই (mock-fight) বাস্তবিকই একটা প্রাণশক্তি জাগাইয়া দিয়াছিল। মার না খাইলে কেহ মার দিতে পারে না। আবার মারামারি করিতে হইলেও দশটা মার পিঠ পাতিয়া সহ্য করিবার মত ক্ষমতা



পুলিনবিহারী দাস



পুলিনবাবু লাঠি খেলা শিক্ষা দিচ্ছেন

ও ইচ্ছা লইয়াই যাইতে হয়। এই সমস্ত কৃত্রিম লড়াইয়ে সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, দল-চালনা প্রভৃতি পৌরুষজনক গুণগুলির অনুশীলন হয়। দুই দলে যখন লাঠি হাতে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া ভীষণবেগে পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত এবং লাঠির ঘাত-প্রতিঘাতে খেলার মাঠ মুখরিত হইয়া উঠিত, সে একটা দেখিবার দৃশ্য ছিল। এমনি করিয়াই সেদিন জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, জাতির প্রাণশক্তি সজীব ও সতেজ হইয়াছিল।

পুলিনবাবুর "লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা" বাঙলা সাহিত্যে একটা যুগান্তর আনিয়াছে। এমন বিস্তৃতভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাঠির কথা, লেখায় আর প্রকাশ হয় নাই। লাঠি ও অসিতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইহাতে আমরা পাই। ইহা ছাড়া পুলিন বাবু যে ছোরাখেলায় ও জুজুৎসু বিদ্যায়ও অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা জানিতে পারি।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ

লাঠির অন্যতম সুদক্ষ খেলোয়ার ৺অতুলকৃষ্ণ ঘোষ বড় লাঠিখেলায় সুবিখ্যাত। শিক্ষিত ও ভদ্র দলে তিনিই বড় লাঠির খেলা সংহতভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রথম প্রচলন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সামর্থ্য লাভের একটা প্রচণ্ড ইচ্ছার উন্মেষ হইল, সেই সময় হইতে অতুলবাবু

ছেলেদের লাঠি শিখাইয়া আসিতেছিলেন। জীবনের শেষ দিনও ইহাই তাঁহার একমাত্র সাধনা ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয়, ১৩৩৪ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার পরলোক গমন হইয়াছে।

অতুলবাবুর লাঠির হাতে খাড় হয় সুবিখ্যাত লাঠিয়াল ৺কাঞ্চন সর্দ্দারের নিকট। কাঞ্চন সর্দ্দার ও রূপ সর্দ্দার দুই ভাই ছিল। এরা ছিল বিখ্যাত রঘু ডাকাতের শিষ্য। রঘু ডাকাতের নামে এককালে বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খাইত। সরকারের হুকুমে যখন রূপ সর্দ্দারের ফাঁসি হইল, তখন কাঞ্চন গা ঢাকা দিয়া হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার অধীন নাওপাড়ে বাস করিত। সেই সময়ে বালক অতুলকৃষ্ণ তাহার শিষ্য হইলেন এবং লাঠি খেলায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ইহার পরেও অতুলবাবু লাঠি শিখিবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অতুলবাবু বলিতেন, সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইলাম, আমার গুরুর খেলার তুলনা পাইলাম না। অমন খেলোয়াড় আর একটি মিলিল না। স্বদেশীর যুগে এলাহাবাদ কংগ্রেস মণ্ডপে নিখিল ভারত লাঠি-প্রতিযোগিতায় খেলিয়া অতুলবাবু সর্ব্বোচ্চ পদক পাইয়াছিলেন।

আশানন্দ ঢেঁকী

এই সকল আধুনিক শিক্ষিত লাঠিখেলোয়াড় ছাড়া দেশে আর একদল লাঠিয়াল আছে যাহারা উত্তরাধিকারী সূত্রে এই

লাঠির চর্চ্চাটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই দেশী লাঠিয়ালের দল আজিও লাঠির ঘায়ে সবুজ মাঠ রাঙা করিয়া তোলে, শুভ্র বালুকাময় চরভূমি রক্তায়িত করে। ইহারাই ছিল পূর্ব্বকার ভূস্বামীদিগের ঢালী সৈন্য (পদাতিক)।

আশানন্দ ঢেঁকী ইহাদেরই একজন ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আশানন্দের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেশের চোর ডাকাত অস্থির থাকিত। আজিও তাহার কত স্মৃতি-কাহিনী, কত অলৌকিক গল্প লোকের মুখে মুখে ভাসিয়া ভাসিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আশানন্দ নদীয়া-নিবাসী এক ব্রাহ্মণ সন্তান। একবার তিনি লাটের খাজনা লইয়া যাইতেছিলেন। পথে রাত্রি হওয়ায় এক বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। একদল ডাকাত তাহার টাকার সন্ধান পাইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিল। আশানন্দ সেকালের নাম-করা লাঠিয়াল ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ হাতের কাছে আত্মরক্ষার কোন কিছু পাইলেন না, পাইলেন একটা ঢেঁকী। সেই প্রকাণ্ড ঢেঁকী ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকাতের দল আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ইহার পর তিনি আশানন্দ ঢেঁকী নামেই সমধিক পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

সে-সময় দস্যু-তস্করের উপদ্রব খুব বেশী ছিল। আর একবার আশানন্দ অনেক টাকা লইয়া কালেক্টরীতে যাইতেছিলেন। সঙ্গে মোটেই জনকয়েক পাইক। এমন সময় হঠাৎ প্রায় দুই শত দস্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। আশানন্দ ভীত হইবার

লোক নন। তিনি সদর্পে লাঠিমাত্র সম্বল লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। সামনে আসিয়াই হঠাৎ দুইটি ডাকাতকে একেবারে বগলে পুরিয়া ফেলিলেন। দস্যু দুইটি অনেক চেষ্টায়ও বন্ধনমুক্ত হইতে পারিল না। এই অসম্ভব ঘটনা দেখিয়া ডাকাতের দল ছুটিয়া পলাইল। আশানন্দ সেই অবস্থায়ই কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। লোক বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। কালেক্টর সাহেবও আশানন্দকে সাহসের যোগ্য পুরস্কার দিলেন।

আজ দেশের নানাস্থানে লাঠির চর্চাটা আবার আরম্ভ হইয়াছে। অনেক সভাসমিতি ও স্কুল-কলেজে লাঠির চর্চা চলিতেছে। মেয়েরাও লাঠি ও ছোড়া খেলিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতেছে। জাতির এই নূতন উদ্যম সফল হোক, জাতি সবল ও সক্ষম হইয়া উঠুক। সুখের বিষয় নদীয়া-শান্তিপুরে আশানন্দের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সার্কাসে বাঙালী

গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

হিন্দুমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র ন্যাশনাল জিমনাষ্টিক ক্লাব স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন চারিদিকে ন্যাশনালের হিড়িক পড়িয়াছিল। নবগোপাল 'ন্যাশনাল মিত্র' নামে পরিচিত ছিলেন। স্বদেশীযুগে হিন্দুমেলা শরীর-চর্চ্চায় নব প্রেরণা দেয়। যে সকল যুবক এই উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া শরীর-চর্চ্চায় মন দেন, তাদের মধ্যে কলিকাতার বাবু গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় অন্যতম। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়।

গৌরবাবু বাল্যকাল হইতে ডানপিটে ছিলেন। বীরত্ব-ব্যঞ্জক পৌরুষ খেলাধূলায় তাঁহার ঝোঁক খুব বেশী ছিল। আহিরী-টোলার ডালপটিতে স্বর্গীয় পালোয়ান অবিনাশচন্দ্র ঘোষের পোড়ো বাড়ী ছিল। অবিনাশ ঘোষ সেকালে একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। ইনি হিন্দুমেলায় পাঞ্জাবী জাঠ পাঠান প্রভৃতি নয় জন পালোয়ানের সহিত এক আসরে উপর্যুপরি লড়িয়াছিলেন। গৌরবাবু ইঁহারই পোড়ো বাড়ীটায় দলবল সহ নানা প্রকার শরীর চর্চ্চা করিতেন।

গৌরবাবুর চেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি আখড়া ও জিমনাসিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌরবাবু নিয়মিতভাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করিতেন।

প্রিয়নাথ বসু ও মতিলাল বসু

গৌরবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন (কলিকাতা) সিমুলিয়ার প্রিয়নাথ বসু। ইনি ও ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মতিলাল বসু বিখ্যাত 'বোসেস সার্কাসের' প্রতিষ্ঠাতা। মতিবাবু স্বামী বিবেকানন্দের সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন। ইঁহারই কথায় স্বামীজী লিখিয়াছিলেন : "He was doing great work than perhaps any Bengalee worker in setting an example in organisation & proving Bengalee nerve & pluck."

বাঙালীর মধ্যে প্রিয়নাথ বাবুই সর্ব্বপ্রথম পিরামিড অ্যাক্ট ও জাগলিং অ্যাক্ট (Pyramid Act & Juggling act) চমৎকার করিয়া গিয়াছেন। জিমন্যাষ্টিকে তাঁর জোর কম ছিল। ভাল ব্যায়াম-বীর অপেক্ষা তিনি ভাল ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন। তিনি শহরে ও শহরের বাহিরে অনেক ব্যায়ামাগারে শিক্ষকতা করিতেন। ইঁহারা সার্কাসের দল লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছেন।

'বোসেস্ সার্কাস' সমগ্র ভারতে বিলাতী কোম্পানীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিল। সামরিক বিভাগের ইংরেজ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়া

গিয়াছেন : I had no idea that the vaulting ambition of young Bengal aspired so high (Sir A. F. Palmer K. C. B. C. S. Commander, Tirah Expeditionary Forces).

কৃষ্ণলাল বসাক

সমগ্র এশিয়াখণ্ডে কৃষ্ণলালের সার্কাসের নাম কে না জানে ? কৃষ্ণলাল কলিকাতা আহিরীটোলার বসাক পরিবারে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত শোভারাম বসাকের গোষ্ঠীর ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই ব্যায়ামানুশীলনে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং ১৭ বৎসর বয়সে তিনি হরাইজণ্টাল বারের খেলায় এরূপ দক্ষ হইয়া উঠেন যে, তাঁহার খেলা দেখিয়া আবেল ক্লেয়ার সার্কাসের (Abell Klaer Olmann circus) মার্কিনবাসী মিস্টার আবেল (Mr. Abell) তাহাকে স্বীয় সার্কাসে নিযুক্ত করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতায় হার্ম্মস্টন ও উড়িয়ার সার্কাসেও তিনি খেলিতে নামিয়াছেন। তিনি আহূত হইয়া এই সব য়ুরোপীয় সার্কাসে যোগ দেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু যখন প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন, তখন তাহারই নিমন্ত্রণে কৃষ্ণলাল ভারতের প্রতিনিধিরূপে প্রদর্শনীতে গমন

করেন। তথায় তাহার নানারূপ ব্যায়াম ক্রীড়া যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাহারাই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রদর্শনীতে মতিলালের আহ্বানে ভারতীয় এ্যাক্রোব্যাট, জিমনাস্ট, কুস্তিগীর, গায়ক, বাজীকর, বাদক, বীণকার, ভাস্কর প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পী যাত্রা করেন। মতিলাল ইহাদের ম্যানেজার হইয়া যান।

নানা সার্কাসের সঙ্গে তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে গিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি স্বয়ং একটি সার্কাস দল গঠিত করেন—উহা "গ্রেট ইস্টার্ণ সার্কাস" নামে ও পরে "হিপোড্রোম সার্কাস" নামে পরিচিত হয়। উহাতে নানা দেশের প্রায় শতেক খেলোয়াড় ও বহু জন্তু ছিল। জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার দলের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং উহা বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার শেষ জীবন নানা ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠায় ও সেগুলিকে সাহায্য দানে অতিবাহিত হয়।

১৩৪২ সালের ৯ই কার্ত্তিক বরাহনগরে কৃষ্ণলালের মৃত্যু হয়।

শিকারে বাঙালী

শিকার ক্ষাত্র-ক্রীড়া। শিকারের উৎসাহ ও উন্মাদনা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের জিনিষ। ইহারই রোমান্স বাঙালী-জীবনকে আকর্ষণ করিয়াছে।

জ্ঞানদাপ্রসন্ন চৌধুরী

ইনি গোবরডাঙ্গা-নিবাসী। বাঙালী শিকারীদের মধ্যে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ শিকারী ছিলেন। ১৮৬৬ সালে তাঁহার জন্ম হয় এবং এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেন। ইনি সঙ্গীত ও শিকারে অনুরাগী ছিলেন। ইনি প্রায় দেড় শত রয়েল বেঙ্গল বাঘ, ৩০টি চিতা, ৩০টি মহিষ, ৫টি হাতী শিকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কাদাখোঁচা (Snipe) পাখী শিকারে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। উড়ন্ত ঝাঁকের অন্ততঃ ৭৮।৮০টি কাদাখোঁচা তাঁর লক্ষ্যের মুখে পড়িতই। ১৯১৮ সালে এই কৌশলী শিকারী পরলোক গমন করেন।

কুমুদনাথ চৌধুরী (কে. এন্. চৌধুরী)

ইনি পাবনা জেলার বিখ্যাত চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এম্. এ. বি. এল্ পাশ করিয়া বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতেন।

ইনি একজন উচুদরের শিকারী ছিলেন। যৌবনের প্রথম হইতেই ইনি শিকারে হাত পাকাইয়াছিলেন। শিকার তাঁর কাছে শুধু আনন্দ বা এ্যাডভেঞ্চার নয়, উহা একটা বিজ্ঞান একটা আর্ট ছিল। কুমুদনাথ মধ্য ভারতের জঙ্গলে বহুবার শিকার করিতে গিয়াছেন। শেষবার সেখান হইতে আক্রান্ত হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার শিকার বিচিত্র রকমের ছিল। কত যে চিতা, চিতল (হরিণ), সম্বর (হরিণ), রয়েল বেঙ্গল বাঘ, ভালুক, বরাহ, বন্য মহিষ প্রভৃতি শিকার করিয়াছেন, ইয়ত্তা নাই।

ইহার বিখ্যাত বই "Sports in Jheel & Jungle" তাঁহারই ভাগিনেয়ী শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বাংলায় 'ঝিলে-জঙ্গলে শিকার' নামে অনুবাদ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

মুক্তাগাছার চৌধুরী বংশ শিকারী বংশ বলিলেই চলে। এই বংশে কম-সে-কম ডজন খানেক উচু দরের শিকারী ব্যক্তির হইয়াছেন : জগৎকিশোর, সূর্য্যকান্ত, শশিকান্ত, মহেশকিশোর, জিতেন্দ্রকিশোর প্রমুখ মহোদয়। ব্রজেন্দ্র নারায়ণের 'শিকার ও শিকারী' বইখানা বাংলা-সাহিত্যে নূতন দান।

বগুড়ার নবাব সাহেব

বগুড়ার নবাব সাহেব পরলোকগত আবদুস্ সোভান চৌধুরী একজন বড় শিকারী ছিলেন।

তরুণ বাঙ্‌লার শারীর-সম্পদ্‌

একদিন বাঙালীর স্বাস্থ্য ও শরীরের অনুপম সৌষ্ঠব দেখিয়া শতবর্ষ পূর্ব্বে লর্ড মিণ্টো লিখিয়াছিলেন—

এমন সুন্দর জাতি আমি আর দেখি নাই। মাদ্রাজীদেরও আমি প্রশংসা করিয়াছিলাম। ইহারা মাদ্রাজীদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। উহারা ছিল কৃশ। ইহাঁরা দীর্ঘকায় পেশীবহুল এ্যাথ্‌লেটের মতো চেহারা—সুগঠিত এবং মুখমণ্ডল ও অঙ্গসৌষ্ঠব নিরূপম। প্রাচীন গ্রীক্‌ ও রোমানদের ন্যায় এঁদের দেহ, এবং তাহাও বহুবিচিত্র।

"I never saw so handsome a race. These are much superior to the Madras people, whose form I admired also. Those were slender. These are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. The features are of the most classical European models, with great variety at the same time." *

Lord Minto's Letter dated the 20th. September 1807 quoted in 'A Dying Race—How dying' by K. L. Sarcar. M. A. B. L.

যাহাদের অতুলনীয় শরীর-সম্পদ্ বিদেশীয়দিগেরও বিস্ময় উদ্রেক করিত, আজিকার বাঙালীর ম্লান, শ্রীহীন ও কঙ্কালসার চেহারা দেখিয়া কে বলিবে ইহারাই শতবর্ষ পূর্ব্বের পৌরুষ বাঙালীর বংশধর ?

এই অতি বড় দুঃখের পশ্চাতে যে বিষাদময় অতীত লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে করুণ ইতি-কথা না-ই বা বলিলাম। বাঙালীর শরীর-সম্পদের ধ্বংসের ইতিহাস অতি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

তারপর অনেক কাল পরের কথা। বাঙালীর জীবনে সেদিন এক পুণ্যতিথি, যেদিন বাঙালা ৺নবগোপাল মিত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে স্বদেশী-মেলায় শরীর-চর্চ্চার কঠোর প্রয়োজনীয়তা চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল। সে বছর পঁচিশেক আগেকার কথা। সেই স্বদেশী যুগের প্রারম্ভ হইতে বাঙালীর শরীর সাধনা ফল্গুর নিরবচ্ছিন্ন ধারার মত ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে। বিশেষ ভাবে বিগত কয়েক বৎসর হইতে এই শরীর-চর্চ্চার আন্দোলন সারা দেশময় ব্যাপিয়া পড়িয়াছে। ইহারই ফলে আমরা একদল তরুণ যুবক পাইয়াছি, যাহারা শরীর সাধনায় সাফল্য লাভ করিয়া বাঙালীর লুপ্ত দেহ-শ্রী ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তাহাদের জন-কয়েকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। ইহাদের পরিচয়ে তরুণ বাঙলার প্রাণে উৎসাহের নবধারা নামিয়া আসুক।

শ্রীভূপেশচন্দ্র কর্ম্মকার

রিপণ কলেজের বি-এস্‌সি ক্লাশের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ইহার পর কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে পড়েন। ১৯২৭ সালে কলিকাতায় যে All-India Best Physique Competition হইয়াছিল, তাহাতে ইনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অথচ ইহার দুই বছর পূর্ব্বে যখন প্রোঃ ঠাকুরতার নিকট ব্যায়াম শিখিতে আরম্ভ করেন, তখন ইহার শরীরে খানকয়েক হাড় ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় নাই। কিন্তু আজ প্রাচীন গ্রীসীয় অতুলনীয় শরীর-সৌষ্ঠবও ইহার দেহ-শ্রীর নিকট হার মানে। ইহার শরীরের ওজন ১১ ষ্টোন ৬ পাউণ্ড। ইনি পেশী সঙ্কোচন, লোহার পাত মোচড়ানো, মোটর রাখা, হিউম্যান ব্রিজ প্রভৃতিতে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন।

শ্রীসত্যপদ ভট্টাচার্য্য বি. এস্‌সি.

ইনি ভার-উত্তোলনে সুদক্ষ। ১৯২৯ সালে ইনি রিপণ কলেজ হইতে বি-এস্‌সি পাশ করেন। বি-এস্‌সি পড়িবার সময় ইনি ১৯২৮ সালে নিখিল ভারত ভার উত্তোলন প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। বাঙালীর সাধারণ খাদ্য ডালভাতই ইহার নিত্যকার আহার। ১৯২৫ সালে যখন প্রোঃ ঠাকুরতার নিকট ব্যায়াম-চর্চ্চা আরম্ভ করেন, তখন ইহার স্বাস্থ্য ও শরীর সাধারণ রকম ছিল। দেড় বছর নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে আজ এই নয়ন-লোভন

শরীরখানি গঠিত হইয়াছে। এই সময়ে ইহার বুকের বেড় ছিল ৪৮ আটচল্লিশ ইঞ্চি।

শ্রীপ্রমোদেশ্বর বসু

ইনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে বি-এ ক্লাশে পড়িতেন। ইনি একই-দিকে চলন্ত দুখানা মোটর টানিয়া রাখিতে পারেন, লৌহদণ্ড বাঁকা করিতে পারেন, মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট (motor accident), Fatal jump ও human bridge প্রভৃতিও করিতে পারেন। ইনি এ সকলই নিজে নিজে অপরের সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা করিয়াছেন। ইনি প্রথমে বুকডন, বৈঠক, মুগুর-ভাজা ও কুস্তি করিয়াছেন, বারবেল ও বারের কসরৎ করেন। বছর দেড়েকের ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে ইহার শরীরের এই চমৎকার উন্নতি লাভ হইয়াছে। ইহার ওজন ১৭০ পাউণ্ড; বুকের বেড় ৪৩½ ইঞ্চি, বাহু (Bicep) ১৫ ইঞ্চি।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখার্জি

ইনি যখন বি-এস্‌সি পড়িতেন, তখন প্রোঃ ঠাকুরতার শিক্ষকতায় দুই বছর নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে ইহার অতি সুন্দর সুস্পষ্ট ও সুগঠিত মাংসপেশীসমূহ (Clear-cut heavy muscles) গঠিত হইয়াছে। আড়াই মণ ওজন অনায়াসে তুলিতে পারেন।

শ্রীবিজয়কুমার মল্লিক

ছোটকালে ইহার শরীর অতি ক্ষীণ ছিল; বাধ্য হইয়া সেকেণ্ড ক্লাশেই পড়াশুনায় ক্ষান্ত দিতে হয়। লিভার অতি খারাপ ছিল, চোখের দৃষ্টি এত ক্ষীণ হইয়াছিল যে তিন হাত দূরের লোক পর্য্যন্ত চিনিতে পারিতেন না। সকলেই তাহার জীবনের আশা একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি বিষ্ণুচরণ প্রভৃতির শরীর-চর্চ্চা দেখিয়া সঙ্কল্প করিলেন, শরীর ভাল করিবেনই। ক্রমান্বয়ে দেড় বছর (একদিনও বাদ না দিয়া) ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে ইহার শরীরের এই অসাধারণ উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে। এককালে যাহার হাড়গুলি একটি একটি করিয়া গোনা যাইত, আজ তাহার দেহের মাংসপেশীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। পেশীসংকোচনে কৃতী।

শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ বি. এল.

বাঙালীর মধ্যে ইনি বোধ হয় প্রকাশ্যভাবে সাধারণের নিকট muscle control (মাংসপেশীর স্বেচ্ছানুরূপ সঞ্চালন) দেখাইয়া প্রথম প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ছোটকালে ইহার শরীর নেহাৎ সাধারণ রকমের ছিল এবং অতিশয় রোগা ছিলেন। ইহার muscle controlএ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়া অনেক সাহেবও ইহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আসিয়া থাকেন। যুযুৎসু বিদ্যায়ও ইহার যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে।

বিষ্ণুবাবুর ভাই আমেরিকা-ফেরত বিখ্যাত স্বামী যোগানন্দ। স্বামী যোগানন্দের শরীর-চর্চ্চা সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান আছে। তাঁর উপদেশও বিষ্ণুবাবুর পেশী-সংকোচনে সহায়তা করিয়াছে। ১৯৩২ সালে বিষ্ণুবাবু ব্যায়াম চর্চ্চা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড গিয়াছিলেন এবং ১৯৩৯এ আমেরিকা গিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার জিমনাসিয়াম হইতে ইতিমধ্যে কয়েকজন শক্তিশালী তরুণ ব্যায়ামগীর তৈরি হইয়াছেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন বি-এ

ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে বাড়ী। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। ভার-উত্তোলন, লোহার পাত জড়ানো, মোটর রোখা প্রভৃতি বিষয়ে ইহার অসাধারণ দক্ষতা। ইহার উদ্যোগে অনেক স্থানে শরীর চর্চ্চার জন্য ব্যায়ামাগার ও ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দাস

যে ছেলেটি একদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া ও অজীর্ণে ক্ষীণ হইয়া কোন রকমে প্রাণের প্রদীপটা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহারই অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্যের কথায় বিস্মিত হইতে হয়। তাহার মোটর-রোখা ঢাকা শহরকে প্রথম বিস্মিত করিয়া তোলে। বুক দিয়া ঠেলিয়া চলন্ত মোটর রোখা ইহার কৃতিত্ব। বছর কয়েকের নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে অজীর্ণ রোগী অনুকূল

আজ এমন শরীর-সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন ; ইনি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

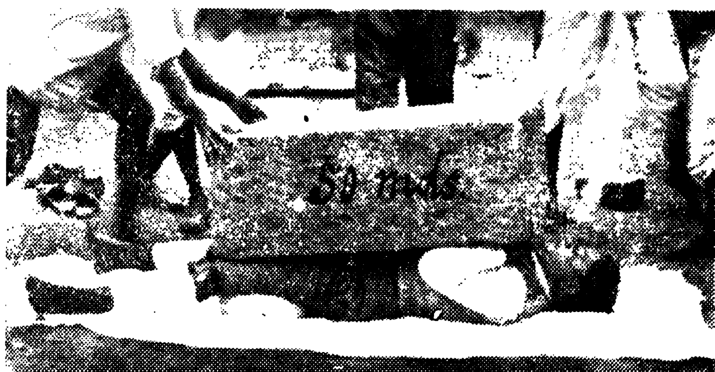
শ্রীবনমালী ঘোষ ও তাহার ভাই সকল

বনমালী ঘোষ, গোবর বাবুর নাম-করা শিষ্য ও খ্যাতনামা পালোয়ান। ইনি গোবর বাবুর সঙ্গে আমেরিকায় গিয়াছিলেন এবং অনেকের সঙ্গে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কুস্তি লড়িয়াছেন। ইঁহার দুই ভাই—শ্রীহর্ষা ঘোষ বি-এ ও শ্রীপ্রকাশ ঘোষ বি-এস্‌সি ; এঁরাও ভাল কুস্তিগীর। হর্ষা ঘোষ ভার-উত্তোলনে ১৯২৫ ও ২৭ সালে দুইবার All Bengal Weight Lifting Cup লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতাস্থ আহিরীটোলায় বসন্তকুমারের পৈতৃক বাস-ভবন। ইঁহার বয়স ২৩ বৎসর। সবেমাত্র মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট্ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন। অথচ এই বয়সেই ইনি এত বিচিত্র রকমের নানাবিধ ব্যায়াম-চর্চ্চায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন যাহা বস্তুতঃই গর্ব্ব ও গৌরবের বিষয়। বাল্যকাল হইতেই বসন্তকুমার ব্যায়াম-চর্চ্চায় অভ্যস্ত। দাঁতে ও হাতে শিকল ছেঁড়া, ৬।৭ মণ ওজনের কামানের গোলা শূন্যে ছুঁড়িয়া তাহা ঘাড়ে ও পিঠে লওয়া, দাঁত দ্বারা টাট্টু তোলা ইত্যাদি শক্তিক্রীড়ায় বসন্তকুমার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বুকে হাতী তোলা ও গুরুভার প্রস্তর খণ্ড ধারণ করা (প্রায় ৫০ মণ)

তাহার অন্যতম শক্তিক্রীড়া। চেয়ারে ঘাড় ও গোড়ালি রাখিয়া সমস্ত শরীর সাঁকোর মত করিয়া স্বর্গীয় শ্যামাকান্তের ন্যায় বুকে পাথর চাপা দিয়া তদুপরি হাতুরীর ঘা' মারা হইয়াছে, বসন্তকুমার ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিয়াছেন! একাধিক মোটর গাড়ী ও লড়ি (মালগাড়া) একই দিকে ধাবমান হইলে টানিয়া রাখিতে



শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পারেন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি কৌতুকপ্রদ রোমাঞ্চকর খেলা দেখাইয়াও বসন্তকুমার কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। শায়িত অবস্থায় বসন্তকুমার ৭ হাত চওড়া ও ১৬ হাত লম্বা একখানি মই পায়ের উপর ধারণ করেন এবং উহার উপর ৮।১০ জন বালক উঠিয়া নানারূপ কসরৎ করিতে থাকে। নাকের উপর একটি বাঁশ ধারণ করেন—উহার অগ্রভাগে পা-বাঁধা একটি বালক

নানারকম কসরৎ দেখাইতে থাকে। তীরের খেলা, বন্দুকের খেলা, ছোরার খেলা ইত্যাদিতেও বসন্তকুমার অভ্যস্ত হইয়াছেন। বসন্তকুমার এক্ষণে শরীর-চর্চ্চা বিস্তারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যায়াম-শালা প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যায়াম শিক্ষা দিতেছেন।

শ্রীষোড়শীকুমার গাঙ্গুলী

কলিকাতা ভবানীপুর আশুতোষ কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় হইতেই ব্যায়াম-চর্চ্চায় ইনি মনোনিবেশ করেন। ইনি দাঁত দ্বারা চারি মণ ত্রিশ সের ওজনের গুরুভার তুলিতে পারেন। ইহা ব্যতীত মোটোর-রোখা, টালীভাঙ্গা, পেশী সঞ্চালন প্রভৃতিতে ইনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহাঁর বর্ত্তমান বয়স ২৮ বৎসর।

শ্রীদিগেন্দ্র চন্দ্র দেব

ইঁহার বাড়ী মৈমনসিংহ জেলায়। মুক্তাগাছা হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মৈমনসিংহ কলেজে পড়েন। এক সময়ে মৈমনসিংহের বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর বাবু ধীরেন্দ্রমোহন সেনের নিকট ইনি বিশেষ ভাবে ব্যায়াম-চর্চ্চা করেন। বর্ত্তমানে তিনি তিনখানি মোটর গাড়ীর গতিরোধ করিতে পারেন, বুকের উপর ১০৮ মণ ভার ধারণ করিতে পারেন, দেড় ইঞ্চি গোলাকার লৌহদণ্ড বক্র করিতে এবং এক হাতে দেড় মণ ভার উত্তোলন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত লাঠিখেলা,

তলোয়ার খেলা, ধনুর্বিদ্যা, সড়কী খেলা প্রভৃতিতে ইনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে অসহায় রমণীদিগের উদ্ধার-কার্য্যে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আইন পড়িয়াছেন। ইনি শরীর-চর্চ্চা শিক্ষা দানে নিযুক্ত আছেন। ইঁহার শরীরের মাপ এইরূপ—৫-১১" ; বুক—৪৩" ; পুরোবাহু (Bicep)—১৭½" ; কটী—৩২" ; উরু—২৬" ; কব্জি—১৩½"।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ (জন্ম ১৯০১ সেপ্টেম্বর)

সাঁতার কাটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। পূর্ব্বে আমাদের দেশের প্রায় সকলেই ইহাতে অভ্যস্ত ছিল। পাড়া-গাঁয়ের জলাশয়গুলিকে সন্তরণ-প্রিয় ছেলেমেয়েদের দল মুখরিত করিয়া তুলিত। শহরের আবেষ্টনে এই সহজ আনন্দটি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিল। ইদানীং কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহরে এ বিষয়ে একটা সাড়া আসিয়াছে। আজ আমাদের পরম গৌরবের কথা, বাঙালী যুবক প্রফুল্লকুমার দীর্ঘকাল সন্তরণে পৃথিবীর সকলের উপরে উঠিয়াছিলেন। প্রফুল্ল-কুমার ১৯৩০ সালের ৩০শে আগষ্ট শনিবার ভোর ৬টা ৮ মিনিটের সময় কলিকাতার কর্ণওয়ালীশ ট্যাঙ্কে (হেঁদুয়া) সাঁতার কাটিতে নামেন। ক্রমাগত ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট সাঁতার কাটিয়া মঙ্গল বার রাত্রি ১টা ১৮ মিনিটের সময় জল হইতে উঠিয়া

আসেন। তাহাকে কর্ণওয়ালীশ ট্যাঙ্ক ২৭৪ বার পারাপার হইতে হইয়াছিল।

শ্রীরবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এলাহাবাদের রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে আলীগড়ে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী ও বহু বে-সরকারী ভদ্রলোকের সমক্ষে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় সন্তরণ করিয়াছেন। ইহার পর, তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে চল্লিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। এলাহাবাদে ইংরেজী দৈনিক লীডারে এই ঘটনার যে বিস্তৃত বর্ণনা হইয়াছিল তাহা হইতে সংক্ষেপে দু-একটি কথা লিখিতেছি।—

"সেদিন সন্ধ্যায় অসম্ভব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। রবীন্দ্র চাটার্জিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট্, রবীনের মা ও ডাক্তার অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, তৎপর পুলিশ ব্যাণ্ডপার্টি, স্কাউট দল ও তাহাদের ব্যাণ্ডপার্টি ছিল। বহু লোক মিছিলে যোগদান করিয়াছিল। যখন সভাস্থলে মিছিল পৌঁছিল, তখন সেই দারুণ গরমেও প্রায় চল্লিশ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্র চাটার্জিকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এরূপ বিপুল উৎসাহ ও সম্মাননা খুব কম ব্যাপারেই দেখা যায়।"

ইহার পর রবীন চাটার্জি এলাহাবাদে ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিঃ সন্তরণে ছিলেন। ১৯৩৬ সালের ৬ জুলাই রাত্রি ১১-২০ মিনিটে লাহোর ডি. এ. ভি. কলেজের পুষ্করিণী হইতে ইনি হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় সাঁতার হইতে উঠিয়া আসেন। ইনি ৬৩ ঘণ্টা এই ভাবে সাঁতারে ছিলেন।

শ্রীমণি ধর

চুলের ও দাঁতের কসরতের জন্য মণি ধরের নাম বিখ্যাত। ইনি ঢাকানিবাসী ৺নগেন্দ্রচন্দ্র ধরের দ্বিতীয় পুত্র এবং কলিকাতার সুবিখ্যাত ধর ব্রাদার্সের অন্যতম মালিক। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার চুল অত্যন্ত ঘন ও কুঞ্চিত ছিল এবং চুলের জন্য বেশ যত্নও করিতেন। ১৯২৫ সাল হইতে ইনি পুলিন দাস মহাশয়ের লাঠি ক্লাবে নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। উহার বছর খানেক পরে একদিন চুলে বাঁধিয়া একটি বারবেল উত্তোলন করেন। ইহার পর হইতেই তিনি চুলের সাহায্যে নানা রকম কসরত শুরু করেন। দাঁতের কসরতও ইহার পর হইতেই আরম্ভ করেন। চুলের সাহায্যে ইনি ৪০০ পাউণ্ড ওজনের বারবেল তুলিতে পারেন, মোটর টানিয়া রাখিতে পারেন, লোক-বোঝাই গরুর গাড়ী টানিয়া নিয়া যাইতে পারেন। দুইজন পূর্ণবয়স্ক যুবক তাঁহার চুল ধরিয়া দুই পাশে ঝুলিয়া থাকে এবং তিনি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকেন, দাঁতে দড়ি বাঁধিয়াও তিনি নিজে শূন্যে ঝুলিতে পারেন, এবং তাঁহার দাঁতে আবদ্ধ দড়ি সহায়ে

একজন যুবক অনায়াসে ঝুলিয়া থাকিয়া নানারূপ শারীরিক কসরত দেখাইতে পারেন। দাঁত ও চুলের ব্যায়াম ছাড়া ইনি লাঠি, ছোরা, জুজুৎসু প্রভৃতি খেলায়ও পারদর্শী। ইনি এ যাবত বহু স্থানে প্রকাশ্যে নিজের এই শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং কলিকাতার অনেকগুলি শরীর-চর্চ্চা-সমিতির সহিত সংশ্লিস্ট আছেন। বর্ত্তমানে ইঁহার বয়স ৩৪ বৎসর (১৯৩৯)।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস

ইনি শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দাস মহাশয়ের ভাগিনেয়। কলিকাতায় মাতুলের নিকট নানাবিধ ব্যায়াম-চর্চ্চা শিক্ষালাভ করিয়া পারদর্শী হইয়াছেন। ইনি লাঠি, ছোরা, তলোয়ার খেলা ও জুজুৎসু বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার তলোয়ার খেলা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। অনাবৃত পেটের উপর আলু পান ইত্যাদি রাখিয়া তলোয়ার দ্বারা কাটা, জিহ্বার উপর চূণ ও লবঙ্গ রাখিয়া কাটা, নাকের উপরের সিঁদুর তুলিয়া নেওয়া, মাথার উপর কলা রাখিয়া কাটা, ইত্যাদি তলোয়ারের খেলা বড়ই চমকপ্রদ। একটি আস্ত কলাগাছের মাথায় একটি নারিকেলসহ জলপূর্ণ কলসী রাখিয়া গাছটিকে তলোয়ার দ্বারা এমন ভাবে টুকরা টুক্‌রা করিয়া কাটেন যে সমগ্র গাছটি আস্তই স্থির ভাবে দাঁড়ানো থাকে এবং উহার মাথার কলসীও কিছুমাত্র টলেনা। শরীর-চর্চ্চার নানা ক্রীড়া দেখাইয়া কুম্ভমেলায়, কংগ্রেসে, হিন্দুমহাসভায় ইনি বিশেষ ভাবে

পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হইয়াছেন। কলিকাতায় কয়েকটি শরীর-চর্চ্চার প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া ইনি এই ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আমরা তাঁহার উন্নতি ও সফলতা কামনা করি। ইঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৩৪ বছর (১৯৩৯)।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

ইনি ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ ও সাউথ সুবার্বান স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষক। ইনি বরিশালবাসী, বাল্যকাল হইতে ব্যায়াম-চর্চ্চায় উৎসাহী ও মনোযোগী ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু নানাপ্রকার জিমনাষ্টিকে সুদক্ষ। ইনি একাদিক্রমে বুকের ওপর ৪ টন লোহার রোলার, লৌহ শিকল ছিন্ন করা ও লৌহদণ্ড বক্র করিতে পারেন।

শ্রীমণি রায়

ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক। ইনিও নানা প্রকার জিমনাষ্টিকে সুদক্ষ এবং অনুপম শরীর গঠনের জন্য সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

শ্রীনীলমণি দাস

ইনি বঙ্গবাসী কলেজে পড়িতেন। ইনি মিঃ চিটটুন ও বিষ্ণু ঘোষের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করেন। বর্তমানে ইঁহার শরীরের ওজন ১ মণ ৩০ সের। ইনি নানা উপায়ে লোহার পাত

বাঁকানোয় সুদক্ষ। এজন্য ইনি Iron man (আয়র্‌ন ম্যান) উপাধি পাইয়াছেন।

মাষ্টার তহম্মল হোসেন

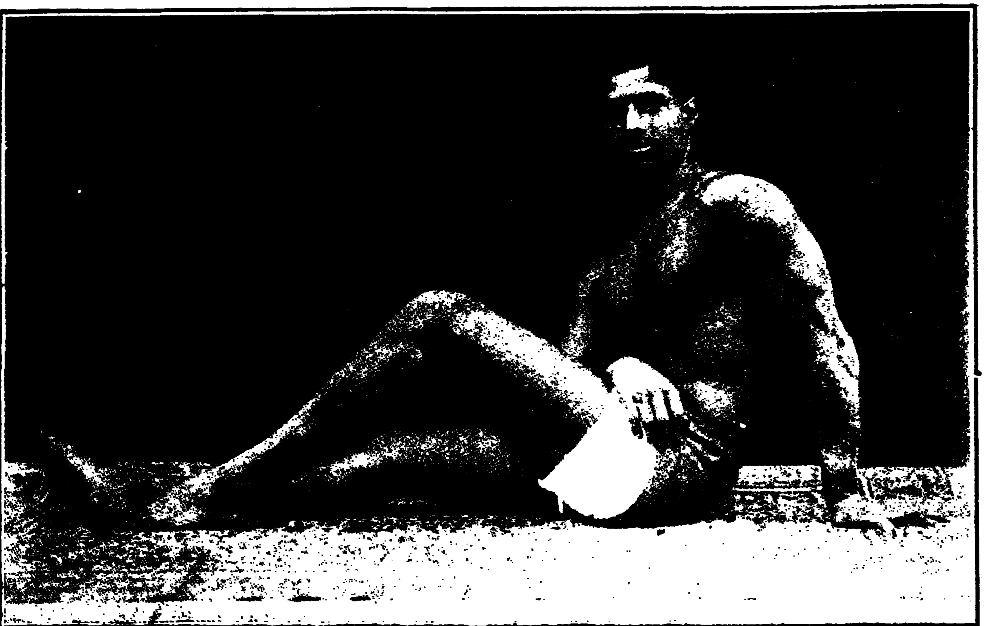
ইনি নবদ্বীপ এ্যাথলেটিক ক্লাবের সভ্য এবং ব্যায়াম-শিক্ষক। বয়স ২২ বছর। প্যারালেল বার, রিং, ট্র্যাপিজ, ফ্রী হ্যাণ্ড ড্রিল, ব্রতচারী নৃত্য, ছোরা খেলা, জুজুৎসু ও পেশী সঞ্চালনে পারদর্শী। ইনি তিন টন রোলার বোঝাই গাড়ী বুকে নেন, ধারাল পেরেকের উপর শুইয়া ৭।৮ জন লোক বুকের উপর নেন। ইনি রিপন কলেজে পড়িতেন এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরের সভ্য। অনেক পুরস্কার পাইয়াছেন। দেহের গঠন সুন্দর।

শ্রীসুধীরকুমার দাস

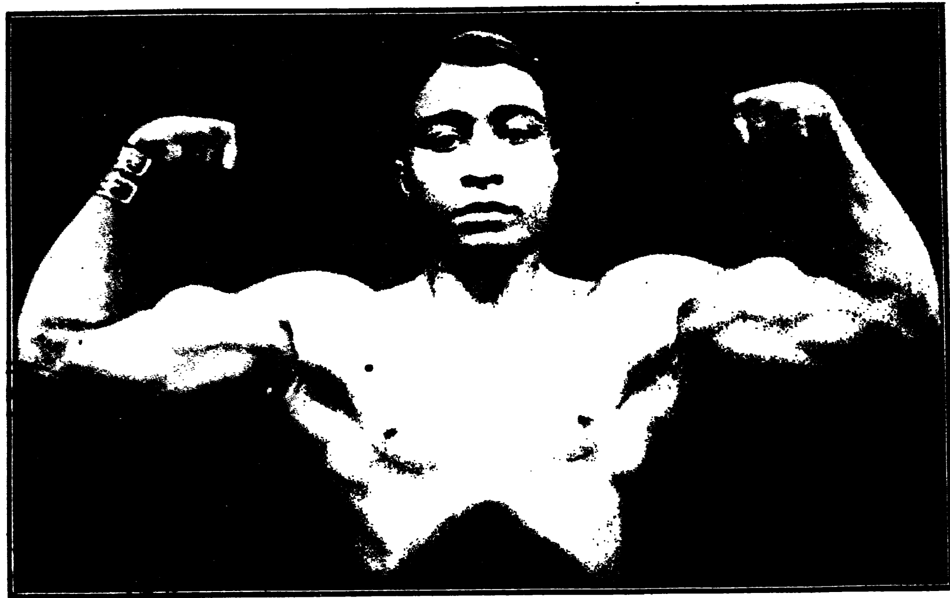
ইনি নিখিল ভারত ভার-উত্তোলন প্রতিযোগিতায় ১১ ষ্টোন এর ভূতপূর্ব চ্যাম্পিয়ন। বাগবাজার জিমনাসিয়ামে ভার-উত্তোলন শেখান। ইনি বাংলা ভাষায় 'ভার-উত্তোলন ও শরীর সাধনা' নামক সুন্দর পুঁথি লিখিয়াছেন।



শ্রীসত্যপদ ভট্টাচার্য্য

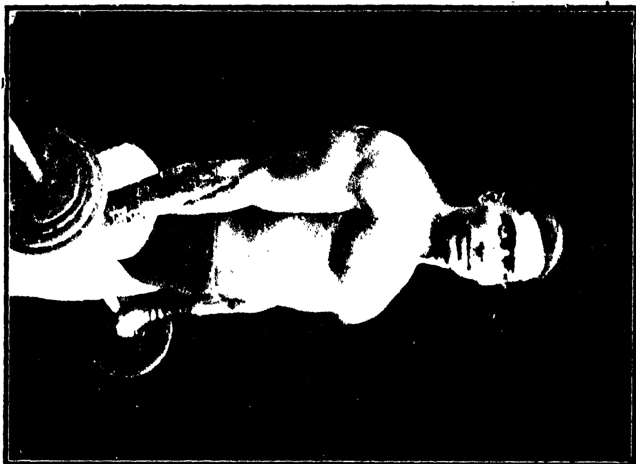


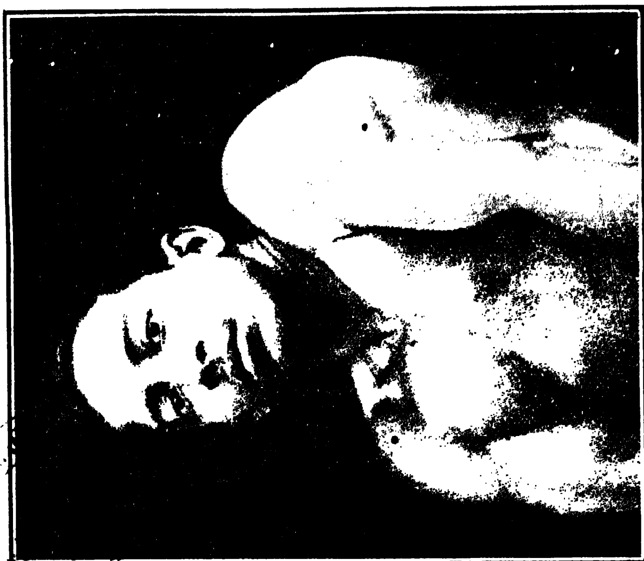
শ্রীভূপেশচন্দ্র কর্মকার

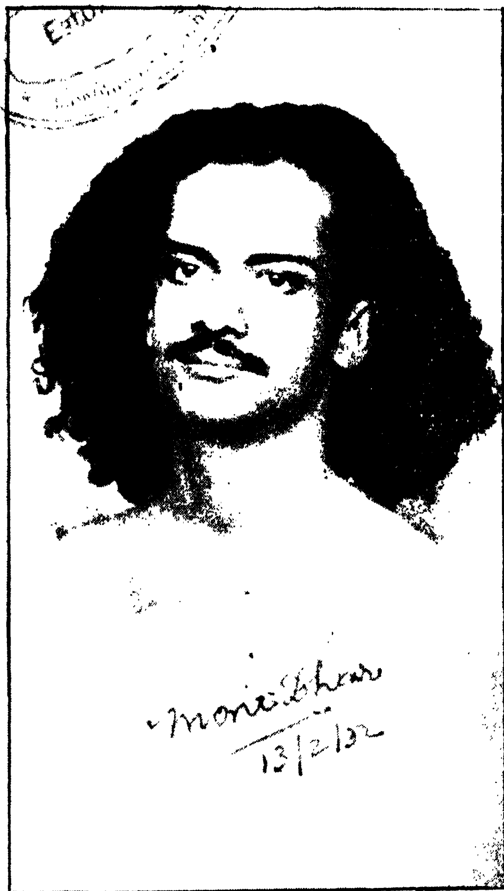


শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ

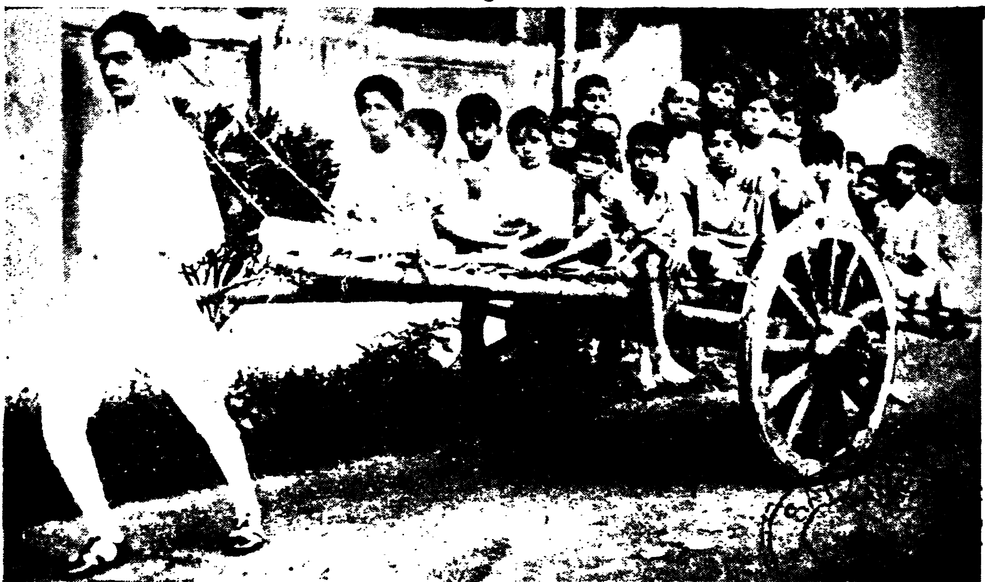
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস





মণি ধর—চুলের ও দাঁতের কস্‌রতে অদ্বিতীয়



মণি ধর—একদল ছেলেপিলে বোঝাই একটা গাড়ী চুলে বাঁধিয়া টানিয়া চলিয়াছেন



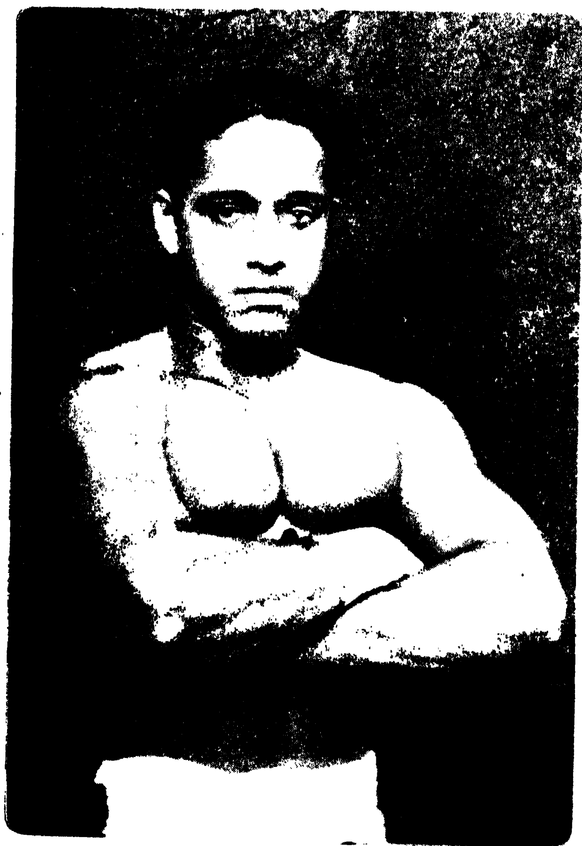
মণি ধর—দাঁতে আবদ্ধ রজ্জু সহায়ে একজন যুবক শূন্যে ঝুলিতেছে



গোবর বাবুর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীবনমালী ঘোষ (মধ্যস্থলে উপবিষ্ট) ও ছাত্রগণ।



শ্রীবসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়



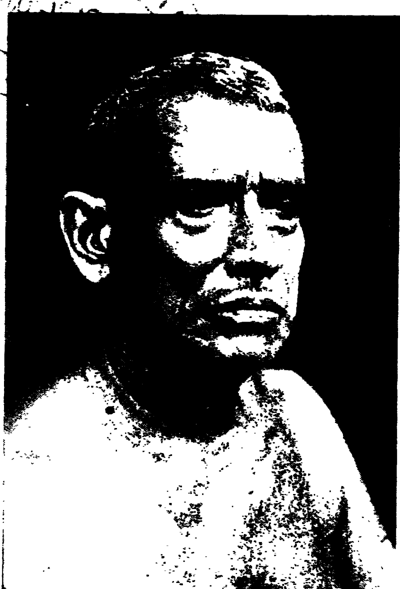
শ্রীষোড়শী গাঙ্গুলী



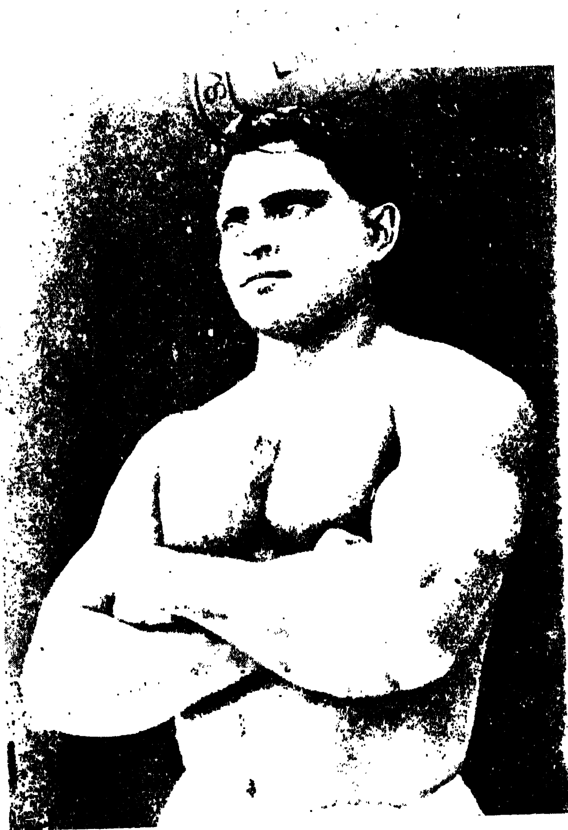
অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়



শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু



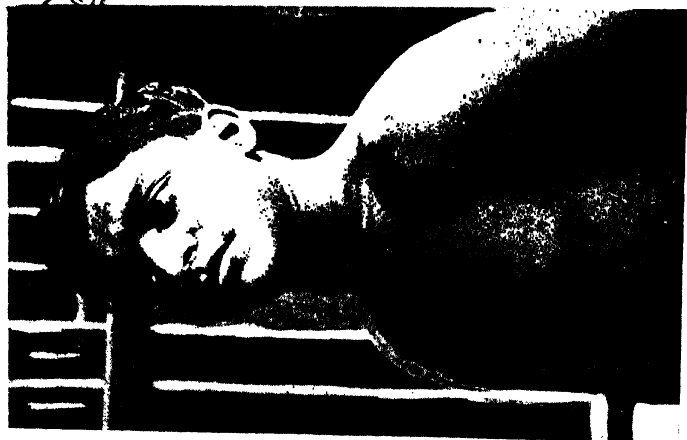
শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু



অপূর্ব্বকুমার দাস

(এলাহাবাদ)





বাংলার বাহিরে বাঙালী ব্যায়াম-বীর

ব্যায়াম-বীর বর্ষাতি বাবু

বিহারের রাজধানী বাঁকীপুরে 'শূরোদ্যান" নামে তথাকার বাঙালীদের একটি ব্যায়ামাগার আছে। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বহু বাঙালী যুবক ও বালক স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছে। স্বর্গীয় অমরনাথ রায় এই ব্যায়ামাগারের অন্যতম উৎসাহী সভ্য ছিলেন। অমরনাথ ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে পিতার কর্ম্মস্থান মোতিহারীতে জন্মগ্রহণ করেন। পাটনার সার্ভে স্কুল হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া তিনি ওভারসিয়ারি পদে নিযুক্ত হন।

"পাটনায় অবস্থান কালে অমর বাবু শূরোদ্যানে যোগদান করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই একজন বলবান্ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একদিকে তাঁহার বিশাল বক্ষ, উন্নত গ্রীবা ও ললাট, দীর্ঘ সুগঠিত পেশল দেহ তাঁহার বীর্য্য-ব্যঞ্জক শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে সুদর্শন করিয়া ছিল, অন্যদিকে তাঁহার ধীর-নম্র অমায়িক প্রকৃতি তাঁহাকে আবালবৃদ্ধ সকলের প্রিয় এবং বাঙালী বিহারী সকলের নিকট সম্মানিত

করিয়াছিল। বাল্যকালে প্রতি বর্ষায় তাঁহার প্রায়ই ফোঁড়া হইত বলিয়া শ্রীরোত্থানের সম্পাদক মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে "বর্ষাতি" এই নাম দিয়াছিলেন।

"প্রায় কুড়ি একুশ বৎসর হইল, এলাহাবাদে একটি ভারত-বর্ষীয় ব্যায়াম-প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহাতে ভারতের নানাস্থান হইতে অনেক হিন্দু-মুসলমান-শিখ পালোয়ান এবং ইংরেজ গোরা স্ব স্ব শক্তি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বিহারের তৎকালীন নেতা স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় সেই নিখিল ভারতীয় মল্ল-ক্রীড়া প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য বাঁকীপুর হইতে বাঙালী বীর বর্ষাতিবাবুকে আপন খরচায় এলাহাবাদ পাঠাইয়া দেন। তথায় বল পরীক্ষণীয় অন্যান্য যন্ত্রমধ্যে একটি স্প্রীং পিসটন বা চাপদণ্ড (Spring piston) রক্ষিত হইয়াছিল। যিনি ঐ পিস্‌টনে অঙ্কিত ১৯ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দণ্ডটিকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিবেন, তাঁহারই জিৎ হইবে। কিন্তু পিস্‌টনে হাত না দিয়া কেবল বুক দিয়া বুকেরই জোরে ঠেলিতে হইবে। কি পশ্চিমা পালোয়ান, কি শিখ, কি গোরা, উপস্থিত কেহই যখন সে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন যুবক অমরনাথ অগ্রসর হইয়া পিস্‌টনে বক্ষ সংলগ্ন করিয়া সবলে তাহা ১৯ চিহ্ন পর্য্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। দর্শকমণ্ডলী আনন্দ-ধ্বনি ও প্রশংসাবাণীতে প্রদর্শনীস্থল মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

"বর্ষাতি বাবুরা চার সহোদরে যখন আহার করিতে বসিতেন, তখন তাহাদের আহার্য্যের পরিমাণ দেখিবার বস্তু হইত। এক একজনের পাত্রে যে রুটির গোছা উপর্যুপরি সাজাইয়া দেওয়া হইত, তাহা পাত্র হইতে প্রায় কণ্ঠ পর্য্যন্ত উঁচু হইত।

"দুঃখের বিষয় প্রবাসী বাঙালীদের গৌরব চিরকৌমার্য্যব্রতী নিরামিষ-ভোজী বিমল-চরিত্র অমরনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বংশগত বহুমূত্র রোগে ৪৫ বৎসর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

এলাহাবাদের তরুণ ব্যায়ামবীর অপূর্ব্বকুমার দাস ও রবীন্দ্র নাথ দেব ব্যায়াম-চর্চায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা এলাহাবাদের এই দুই তরুণ প্রবাসী ব্যায়াম-বীরের ছবি দিলাম। বড়ই দুঃখের বিষয়, ইহাদের মধ্যে বালক বারীন্দ্রনাথ দেব অল্প বয়সেই পরলোক গমন করিয়াছেন।

ড্রিল ও প্যারেড্

বাঙলাদেশে শরীর-চর্চ্চা এক নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের পর হইতে। কংগ্রেসের উক্ত অধিবেশনের সময় হইতে ড্রিল ও প্যারেড বাঙালী যুবকদের প্রাণে এক নবচেতনা আনিয়াছে। ব্যায়াম-চর্চ্চার মধ্যে ড্রিলের মত জাতীয় জীবনকে পরিপূর্ণ ও শক্ত-সমর্থ করিবার এমন শিক্ষা আর নাই। দেশের সৌভাগ্য, আজ এদিকেও জাতির নজর পড়িয়াছে। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের অতি অল্প সময়ে যেরূপ সুসংহত ও সুশিক্ষিত ভলান্টিয়ার-দল গঠিত হইয়াছিল, উহাতে আশা ও ভরসা খুবই হয়। দেশের নানাস্থানেই আজ ড্রিলের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে; সুনিয়ন্ত্রিত হইলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের এই ম্লান চেহারা বদলাইয়া দিতে পারে। এই কংগ্রেস উপলক্ষে ড্রিল ও প্যারেডে মেয়েরাও যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ প্রশংসনীয়।

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোর এ বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছে। আবার কিছুকাল মধ্যে ড্রিল ও ব্যায়ামাদি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছেলেদেরও অবশ্য-করণীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই।

মেয়েদের ব্যায়াম-চর্চ্চা

মেয়েদের ব্যায়াম-চর্চ্চায় এতদিন দেশ একেবারে উদাসীন ছিল। আজকাল বাংলায় নারী-জাগরণের একটা সাড়া আসিয়াছে। ইহারই ফলে আমাদের দৃষ্টি জাতির অর্দ্ধ-চৈতন্য এই নারীসমাজের উপরেও পড়িয়াছে। এতদিন অন্তঃপুরের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নারীর কর্ম্মগণ্ডী নির্দ্দিষ্ট ছিল, আজ সেই গৃহলক্ষ্মীর আহ্বান আসিয়াছে, তাঁহাকে বিশ্বের সকল কর্ম্মযজ্ঞে যোগ দিতে হইবে। ঘরে ও বাহিরে, গৃহে ও সমাজে নারীকে আজ আপনার দানে ও কর্ম্মে সকল শূন্যতা ও দীনতা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে—জাতিকে পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ দিতে হইবে।

শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়া দেহকে কর্ম্মপটু করিবার জন্য নারীসমাজে একটা নব প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে শরীর-চর্চ্চা অনেক কাল হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতে-ছিল। সেই স্বদেশীর যুগে বাঙ্‌লার মহিমময়ী বীরমাতা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ইহার প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহার প্রচেষ্টা শুধু বাঙ্‌লার পুরুষকে নয়, বাঙ্‌লার নারীসমাজেও একটা চেতনা আনে। বীরাষ্টমী সমিতি ইহারই ফল। তাহারপর বিগত কয়েক বছর বাঙলার নারীসমাজ আপনার শারীর-সামর্থ্য লাভের জন্য

একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন, দেশের নানাস্থানে লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু প্রভৃতি আত্মরক্ষার সহজ ও অব্যর্থ উপায়গুলি আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। ইহারই ফলে অনেকগুলি মহিলা-প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চ্চা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল।

বাঙালী মেয়ের শরীর সাধনার এই নব উদ্যম ও নূতন গতি জয়যুক্ত হোক্।

দুই একজন বাঙালী নারীর শক্তির পরিচয় এখানে লিখিলাম।

সুশীলাসুন্দরী

"যে সময়ের কথা বলিতেছি সে যুগে কোন বাঙালীর মেয়ের পক্ষে প্রকাশ্য সার্কাস রিংএ অবতীর্ণ হইয়া খেলা দেখান নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল। বাঙলাদেশ সে অভাবও পূরণ করিয়াছে। সার্কাস-জগতে সে গৌরবের পাত্রী প্রথম বাঙালী মহিলা-খেলোয়াড় শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী। ইহার পূর্ব্বে অপর কোন বাঙালীর মেয়ে সার্কাস খেলায় যোগদান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। শুধু যোগদান করা নহে, সুশীলা সুন্দরীর কৃতিত্ব—তাঁহার অদ্ভুত শারীরিক শক্তির ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন-ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। কেহ কেহ বলেন, সুশীলা সুন্দরী সমগ্র ভারতের মধ্যে হিংস্র ব্যাঘ্রের খেলা দেখাইতে সর্ব্বপ্রথম মেয়ে-খেলোয়াড়। মহারাষ্ট্র দেশীয় বহু মহিলা বহুদিন হইতে সার্কাস খেলায় অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু বন্য ব্যাঘ্র লইয়া প্রকাশ্য সার্কাসে খেলা দেখাইয়া কেহ যশস্বিনী হইতে পারে নাই। শ্রীমতী সুশীলা

কলিকাতার সোনাগাছি অঞ্চলের অধিবাসিনী। সুশালার দুই পুত্র ছিল—কনিষ্ঠ পুত্র হীরেন্দ্রনাথ নিউ বেঙ্গল সার্কাসের পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী।" (ব্যবসা ও বাণিজ্য)

অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনি কলিকাতা-নিবাসী বাবু নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি ক্রমাগত নিউমোনিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি কঠিন রোগে ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। সুস্থ সবল হইবার পর ইনি নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম-চর্চ্চা আরম্ভ করেন। ইহাতে ইনি বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। ক্রমশঃ ইনি লাঠি ছোরা যুযুৎসু খেলাতেও সুদক্ষ হইয়া উঠেন। কয়েক বছর পূর্ব্বে কলিকাতায় রামমোহন রায় শতবার্ষিকী প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ইনি বেগবান্ মোটর গাড়ী রোধ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তখন ইহার বয়স ছিল মাত্র পনের বছর। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এমন শক্তিমত্তার পরিচয় সত্যই দুর্লভ।

প্রমীলাসুন্দরী

প্রায় ২৫।২৬ বছর পূর্ব্বে বাঙালী মেয়ে প্রমীলাসুন্দরী সার্কাস খেলা দেখাইয়া লোকের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন। বেণীবাবুর এ্যাক্রোব্যাটস সার্কাসে ইনি খেলা দেখাইতেন, লোক বোঝাই পাল্কা-গাড়ি বর্শা দিয়া ঠেলিয়া নিতেন, ৩০ মন ওজনের পাথর বুকে ভাঙ্গিতেন, তিন মন ওজনের গোলা লইয়া খেলা দেখাইতেন। তিনি বোসেস্ সার্কাসেও খেলা দেখাইয়াছেন।

শরীর-চর্চ্চা-প্রতিষ্ঠান

অতীন্দ্র বাবু ও শিমলা ব্যায়াম সমিতি

শ্রীযুত অতীন্দ্রনাথ বসু কলিকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। অতীন বাবু যৌবনকাল হতেই শরীর-চর্চ্চায় দক্ষতা লাভ করেন। তাঁদের বাড়ীতেই কুস্তি ও ব্যায়ামের একটি আখড়া করিয়াছিলেন। এখানে ছেলেরা জিমনাষ্টিক ও কুস্তি করিত। অবশেষে ১৩২৬ সালে তিনি শিমলা ব্যায়াম সমিতি নামে একটি বড় রকমের সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

বাঙালী ছেলেরা যাহাতে শরীর চর্চ্চা দ্বারা সবল ও সাহসী হইয়া উঠে, এই উদ্দেশ্যেই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অতীন বাবুর বয়স এখন ৬০ বৎসর। এই বয়সেও তাঁর উৎসাহের অন্ত নাই। ইহার মধ্যে এই সমিতি একদল তরুণ ব্যায়ামবীর তৈরি করিয়াছেন—তাঁরা সত্যই আমাদের গৌরব।

বর্ত্তমানে এই সমিতির ব্যায়াম-শিক্ষক অতীনবাবুর পুত্র শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ বসু। বীরেনবাবু ইতিমধ্যে কুস্তি ও যুযুৎসু সম্বন্ধে বাঙলা পুঁথি লিখিয়া দেশের একটি বড় অভাব দূর করিয়াছেন। বীরেনবাবু যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। বাল্যকালে

ইনি কুস্তি লাঠি ও যুযুৎসু বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। এখন ইঁহার বয়স ৩৩ বছর।

অতীনবাবু বাঙালী কুস্তিগীর ছেলেদের মধ্যে নিখিল-বঙ্গ কুস্তি প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। বীরেনবাবু এ বিষয়ে অনেকখানি সাহায্য করিয়া থাকেন।

এই সমিতির একটি উজ্জ্বল রত্ন শ্রীমান্ ঘনশ্যাম দাস। ইহার শরীর সুগঠিত, মাংসপেশীসমূহ সবল এবং শরীর শক্তিসম্পন্ন। বর্ত্তমানে ইহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর। শিমলা ব্যায়াম সমিতিতে ভর্ত্তি হইয়া নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা করেন। এই কয় বৎসরের একান্ত অধ্যবসায় ও চেষ্টায় এবং ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীবীরেনবাবুর শিক্ষায় আজ এইরূপ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহার নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি দেখিলেই ইহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে—

সিমলা ব্যায়াম-সমিতি-পরিচালিত ভারতীয় কুস্তি প্রথায় বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় ১৯৩৭ সালে ৯ ষ্টোন বিভাগের চ্যাম্পিয়ন, ১৯৩৮ সালে ১০ ষ্টোন বিভাগের চ্যাম্পিয়ন, ১৯৩৯ সালে ১১ ষ্টোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ সালে দৈহিক সৌন্দর্য্যে বিজয়ী হন। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে খিদিরপুর ব্যায়াম-সমিতি-পরিচালিত নিখিল কলিকাতা পেশী-প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় (All Calcutta Muscle-

posing Competition) দৈহিক সৌন্দর্য্যে বিজয়ী হন। ১৯৩৮ সালে হাটখোলা ব্যায়াম-সমিতি-পরিচালিত নিখিল বঙ্গ পেশী-সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় (All Bengal Muscle-posing Competition) দৈহিক সৌন্দর্য্যে বিজয়ী হন। ১৯৩৯ সালে সমগ্র বঙ্গদেশে দৈহিক সৌন্দর্য্যে বিজয়ী হন।

কুস্তিতেই ইনি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ইনি বহু জোরের খেলা দেখাইতে পারেন। সকল বিষয় অপেক্ষা তাহার দৈহিক গঠনের সুষমাই লোভনীয় ও অনুকরণ-যোগ্য।

ইহা ছাড়া এই সমিতির নিম্নলিখিত তরুণ ব্যায়ামগীরেরা অনেক কুস্তি-প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—মুরারী মোহন বসু, নরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, রবীন্দ্রনাথ বসু, শ্যাম ভড়, গণেশচন্দ্র কুণ্ডু, অভয় প্রামাণিক, কৃষ্ণ বানার্জি, রাম দে, কানাই প্রামাণিক, রাধারমণ দাস, ভবতোষ দত্ত, সুনীল সেন, মধু দাস, শ্যাম অধিকারী, ধীরেন বিশ্বাস, মণি দাস।

সেকালের বাংলায় কুস্তি

জাতি জাগে বর্ষার বন্যাধারার মতো। তার প্রবল প্রবাহে জাতির সকল অঙ্গ সতেজ হয়ে ওঠে। তার মনে জাগে নূতন আশা, দেহে জাগে পুলকের উন্মাদনা। মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়িয়ে চলে তার দেহের উন্নতি।

পশ্চিমের উঠ্‌তি জাতগুলোয় আমরা এইটে বিশেষ করে দেখতে পাই। 'জার্মানীতে খেলাধূলা, শারীরিক ব্যায়াম ও কসরৎ অতিশয় প্রবলরূপে দেখা দিয়েছে। সাঁতার কাটা, দৌড়, হকি, টেনিস, নৌচালনা, কুস্তি, পালোয়ানা ইত্যাদি সকল দিকেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ঝোঁক দেখিতেছি। স্বাস্থ্যোন্নতি ও শক্তি-বৃদ্ধি জার্মান সমাজে আজকাল এক নয়া ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।'[১] আবার রাশিয়ায় দেখছি, শারীরিক পূর্ণতা সাধনা সেখানে একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ লক্ষ ক্লাব বা সমিতি গড়ে উঠেছে; আর এরা সকল রকম খেলাধূলায় যোগ দিচ্ছে। রাশিয়ায় একটা চলতি কথা আছে: 'শিশুরাই জীবনের ফুল।' সেই ফুলকে পুরো বিকশিত করবার এমন বিরাট আয়োজন এমন বিপুলভাবে আর হয় নি।[২]

(১) অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার (পরাজিত জার্ম্মাণী পৃঃ ১২৪)

(২) The Leader of 8. 9. 36.

সেকালের বাংলায় কুস্তি

বাংলা দেশেও জাগরণের ঢেউ এসেছে। এদেশে আগে শরীর-চর্চ্চার চল ছিল। একশ বছর আগেও কুস্তি-কসরতের প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা হত। সেকালের কাগজে অনেক কুস্তির খবর বের হয়েছে। ১৮২৫ সালের 'সমাচার-দর্পণে' প্রকাশিত হয় :

রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের বাগানে এক কুস্তির দঙ্গল হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায় ব্যাঙ্ক-অব্-বেঙ্গলের প্রথম বাঙালী ডিরেক্টর এবং উলুবেরিয়া হইতে পুরী সিংহদরজা পর্য্যন্ত 'কটক রোডের' প্রতিষ্ঠাতা। এই বাগানে প্রায় ৬০ জন লোকের দঙ্গল হয়। সাহেবেরাও এই দঙ্গল দেখিতে আসিতেন। পামর সাহেবের এক অতিকায় ভৃত্য ছিল। তাহার সঙ্গে নন্দকুমার ঠাকুরের বৈদ্যনাথ নামে এক জোয়ান ভৃত্যের দঙ্গল হয়। এই লড়াইয়ে বৈদ্যনাথ জয়ী হয় এবং দর্শকগণ ঘন ঘন করতালি দেন। নন্দকুমার বাবু স্বয়ং গায়ের একলাই শিরোপা খুলিয়া বৈদ্যনাথকে পুরস্কার দেন। এই কুস্তিতে যারা যোগদান করেছিল তারা সকলেই পুরস্কৃত হয়েছিল। চাঁদা তুলে একটা ফণ্ড করা হয়েছিল, তা থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হত।

১৮২৭ সালেও একটি বিশেষ কুস্তি বিবরণ প্রকাশিত হয়। সমাচার দর্পণের নিজের ভাষায় বলি—"স্বদেশীয় বিদেশীয় মোগল পাঠান মুসলমান বাঙালী তাহারা দুই দুই জন এক এক বার মল্লযুদ্ধ করিয়াছিল। যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে

তাহারা পারিতোষিক পায়। যে ব্যক্তি জয়ী হয় তাহার অধিক প্রাপ্তি হয়। এই কুস্তি দর্শনে হৃষ্ট মনে ঐ স্থানে শ্রীযুত বিচারকর্তা সাহেব লোকেরা ও আর আর ইংরেজ লোকেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেক মান্য লোকও গিয়াছিলেন।"

১৮৩৬ সালে বালি গ্রামে মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন অতিশয় শক্তিমান্ কুস্তিগীর ছিলেন। ঐ অঞ্চলে সে-সময়ে রাধা গোয়ালা ও তাহার ছেলেরা নামকরা কুস্তিগীর ছিল। মহেশচন্দ্র তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বহু বছর কুস্তি শিখাইতে পারিতেন। মহেশচন্দ্র যে-কোন লোককে কুস্তিতে আহ্বান করিয়াছিলেন।

আমরা সমাচার-দর্পণে এই খবর প্রকাশিত দেখিয়াছি।

এই সময়ে আর একটি কুস্তি হয় পাথুরিয়াঘাটার দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাড়ীর সম্মুখে। ইহাতে বাঙালী বালকেরা শুধু নয়, বালিকারাও যোগদান করেছিল। শতবর্ষ পূর্বের প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় বাঙালী বালিকাদের যোগদান সত্যই জাতির পরিপূর্ণ প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়। সেদিন 'সমাচার-দর্পণ'ও আনন্দে লিখেছিল: "বিশেষতঃ বালিকাদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হয়।"[১]

আর আজ? ছেলেদের মধ্যে শক্তিচর্চ্চা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বটে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তার চিহ্ন বড় কম। কেন

(১) সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা।

এমন হ'ল ? এক শ' বছরে এমন দারুণ পরিবর্তন কিসে সম্ভব হয়েছে ? এর জবাব বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই সঞ্জীব চাটার্জি লিখেছেন :

"যাহাদের বিশ্বাস যে ইংরেজ-প্রসাদাৎ ইদানীং কুস্তি আরম্ভ হইয়াছে তাহাদের ভুল। ইংরেজী শিক্ষা ও শাসনে বরং আমাদের কুস্তি উঠিয়া গিয়াছে। প্রাতে বালকেরা পাঠাভ্যাস করে, কুস্তির অবকাশ থাকে না। ইতর লোকেরা কুস্তি করিলে তাহাদের উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে, সুতরাং কুস্তি রহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি ইতর লোকদিগকে কোন কার্য্যের ভার দিলে তাহারা তাল ঠুকিয়া সম্মতি জানাইত। এখন আর সে তাল ঠোকা নাই ; কারণ সাধারণ লোকের মধ্যে আর সে কুস্তি নাই, সে বল নাই।"

সুখের বিষয়, বাঙালী-জীবনে আবার ব্যায়াম-চর্চ্চার একটা আলোড়ন এসেছে। তারই ফলে স্থানে স্থানে গড়ে উঠেছে ক্লাব, সমিতি, আখড়া।

কিন্তু একটি নিখিল ভারতীয় কুস্তি-সমিতি এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য কুস্তির নিয়মকানুন আজও গঠিত হয় নাই। ভারতীয় কুস্তি চর্চ্চার উন্নতি ও বহুল প্রচার করিতে হইলে ইহা আজ একান্ত আবশ্যক।

পৃথিবী-পর্যটনে বাঙালীর ছেলে

শরৎচন্দ্র রায়

"শরৎচন্দ্র রায় নামে একটি সতের বছরের বালক ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে পদব্রজে পৃথিবী পরিভ্রমণে বের হয়েছিলেন। সে আজ আট বৎসর আগের কথা। প্রায় সাত হাজার মাইল অতিক্রম করে অবশেষে তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হন।

"শরৎচন্দ্র কলিকাতা হতে বার হয়ে প্রথমে যান পেশোয়ারে। সেখান থেকে সীমান্ত প্রদেশ পেরিয়ে খাইবার গিরিসঙ্কট অতিক্রম করবার সময় তিনি বন্দী হন আফ্রিদিদের হাতে। এখানে অনেক লাঞ্ছনা তাকে সহ্য করতে হয়। কোন রকমে সেখান থেকে মুক্তি লাভ করে যান কাবুলে। তারপর পারস্য ঘুরে ককেশাস পর্বত লঙ্ঘন করে, পথে আরো অনেক রকমের নিগ্রহ সহ্য করে তিনি উপস্থিত হন রাশিয়াতে। সেখানকার মস্কো লেনিনগ্রাড প্রভৃতি স্থান দেখা শেষ হলে তিনি ধরলেন জার্মানীর পথ। জার্মানীর নাজি গবর্ণমেণ্ট তাকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করলেন। তিনি নিক্ষিপ্ত হলেন আবার কারাগারে। অনেক কষ্টে কারাগার হতে মুক্ত হয়ে তিনি যান ইংলণ্ডে। নিঃস্ব, রিক্ত-হস্তে এই যুবকটি এইবার ফেরিওয়ালার কাজ নিয়ে জীবিকা

উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু এর আগেই পথ-শ্রমে নানা রকমের নির্য্যাতনে ও অনাহারে তার দেহ ভেঙ্গে পড়েছিল। লণ্ডনে তিনি বারমাস ছিলেন। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংলণ্ডের একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।”

বিমল মুখার্জি

১৯২৫ সালে ইনি দুই বন্ধুসহ কলিকাতা থেকে পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হন। এশিয়া, ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া ইনি ১৯৩৭ সালে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার বয়স এখন ৩৭ বছর। তিন বন্ধুর মধ্যে ইনিই সফলকাম হইয়াছেন।

রামনাথ বিশ্বাস

গত ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস সিঙ্গাপুর ত্যাগ করিয়া সাইকেলে মলয় প্রদেশ, শ্যাম, ইণ্ডোচীন, কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, কানাডার একাংশ, বালি, মাণ্ডে ই, রেঙ্গুন, মণিপুর, কলিকাতা, পেশোওর, আফগানিস্থান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, লেভাণ্ট, তুর্কী, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, জেকোস্লোভাকিয়া, জার্ম্মনী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে আমেরিকা ও আফ্রিকা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক

হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এরূপ প্রচেষ্টা কেহ করে নাই। এই প্রস্তাবিত ভ্রমণ শেষ হইলে তিনিই একমাত্র ও প্রথম ব্যক্তি হইবেন যিনি বাইসাইকেলে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি ভ্রমণকারীদের জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইংরাজীতে এক পুস্তক লিখিতেছেন। উহাতে ভ্রমণকারীদের অনেক সুবিধা হইবে।

পরিশিষ্ট

সরল ব্যায়াম-প্রণালী

আমাদের দেশের প্রচলিত বুকডন ও বৈঠক সকলের পক্ষেই করা সহজ। উহাতে শরীরের সর্ব্বাঙ্গেরই সঞ্চালন হয়।

ডন (দণ্ড) ও বৈঠক ভারতের জাতীয় কসরৎ। ভারতে এমন লোক বিরল, ডন বৈঠক সম্বন্ধে যে কিছু না জানে। প্রত্যেক কুস্তিগীর ভার তোলা, মুগুর ভাজা এবং ডন-বৈঠক করিয়া থাকেন। ডন-বৈঠক সকল কসরতের মূল ভিত্তি। শুধু ডন-বৈঠক একটি বিশিষ্ট ব্যায়াম-প্রথা হইতে পারে, আবার ইহা অন্যান্য কসরতের আরম্ভ বা ভিত্তিও বটে। ডন ও বৈঠক খালি হাতের ব্যায়াম। যতদিন ও যতখানি পর্য্যন্ত মাংসপেশী পুষ্ট হবার, ডন-বৈঠক তাহা করে। অধিকন্তু ডন-বৈঠক সহিষ্ণুতা বাড়ায়।

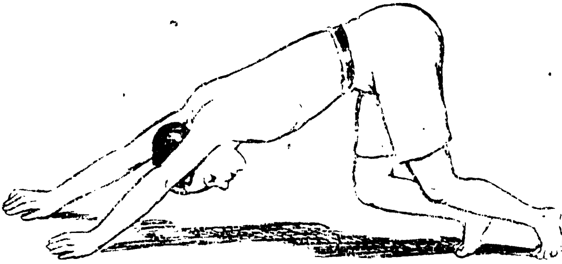
ডনে শরীরের সমস্ত অঙ্গ বিকশিত হয়। বুক, ঘাড়, পিঠ, বাহুর ঊর্ধ্বাংশ ও মেরুদণ্ডের ইহা অতি চমৎকার ব্যায়াম। ইহাতে শরীরের গঠন সুন্দর হয়, মেরুদণ্ডের স্নায়ু সতেজ হয় এবং অনুপম বুকের গড়ন হয়।

ডন শুধু ছেলেরা কেন, মেয়েরাও করিতে পারেন। আরম্ভে ডন দৈনিক ৫০ টি করা উচিত। আমাদের কুস্তিগীরগণ রোজ ৫০০ শত ডনের বিধান দেন। বড় বড় কুস্তিগীরগণ রোজ ২০০০ হাজার ডন করেন। রোজ ৫০০০ ডন ভারতীয় রেকর্ড।

বৈঠক, ডনের অনুপূরক ব্যায়াম। পায়ের শক্তির উপর বুক ও ফুসফুসের শক্তি নির্ভর করে। কনুই বাঁকিয়ে কসরৎ করা এই সামর্থ্য

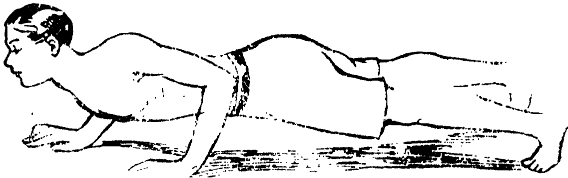
আনে। কাজেই পায়ের কসরৎ খুব ভাল রকম জোরের সহিত হওয়া দরকার। আমাদের দেশে পালোয়ানগণ সাধারণতঃ ডন যতটি করেন, তার ডবল বৈঠক করিয়া থাকেন। একটি লাঠি বা থাম হাত দিয়া ধরিয়াও বৈঠক করা হয়। অনেকে এভাবেও হাতটির আশ্রয় রাখিয়া বৈঠক করিয়া থাকেন।

ব্যায়াম নং ১ (বুকডন বা ডন)



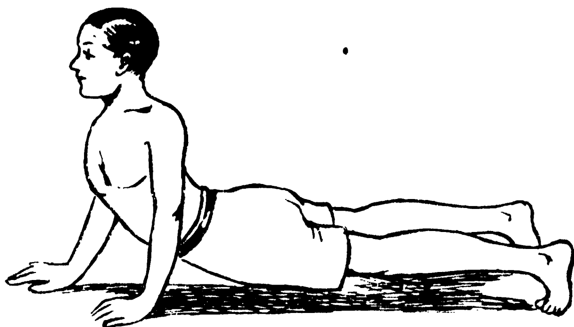
ক

১। ক-চিত্রটির মত মাটিতে হাত ও পা এক এক হাত অন্তর স্থাপিত



খ

কর, পূর্ণ নিঃশ্বাস লও, দম বন্ধ রাখ। তারপর জলদি সামনের দিকে ঝুঁকিয়া খ-চিত্রটির মত বুক নীচে নামাও এবং গ-চিত্রটির মত কোমর নাচু করিয়া ঘাড় ও বুক উঁচু করিয়া উক্ত অবস্থান লও এবং সাথে সাথে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দাও।

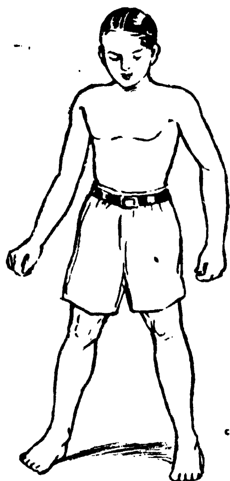


গ

বার—৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬০ পর্য্যন্ত।

ব্যায়াম নং ২ (বৈঠক—১ম প্রকার)

১। দুই পা পরস্পর ১৮ ইঞ্চি অন্তরে রাখিয়া সরলভাবে দাঁড়াও,



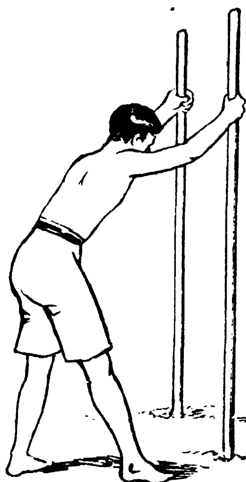


ঙ

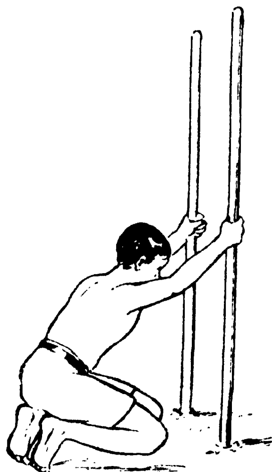
সম্মুখে তাকাও, পুরা নিঃশ্বাস লও (চিত্র ঘ) এবং উক্ত অবস্থায় কয়েক ইঞ্চি সম্মুখে লাফাইয়া আইস, সঙ্গে সঙ্গে গোড়ালির ওপর বস (ঙ)। পুনরায় দাঁড়াও এবং দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব স্থানে যাও এবং সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাসও ছাড়িতে থাক। বসার সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইটি মাথার উপরের দিকে উঠিবে এবং দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইটি নীচে নামিবে।

বৈঠক—২য় প্রকার

বাঁশের খুঁটা বা থাম অবলম্বন করিয়াও বৈঠক করা যায়। চ ও ছ চিত্র দ্রষ্টব্য। প্রথমে চ অবস্থানে দাঁড়াইয়া পরে ছ অবস্থানে গোড়ালির



চ



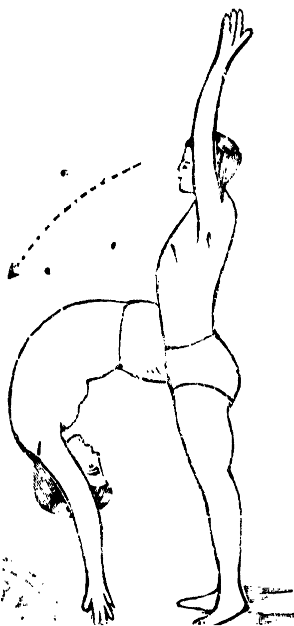
ছ

ওপর বসিবে। ইহাও ১ম প্রকারেরই অনুরূপ, শুধু হাত দুটি দ্বারা থাম ধরা থাকিবে।

বার—১০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত।

ব্যায়াম নং ৩

৩। জ-চিত্রের মত সোজা হইয়া দাঁড়াও, দুই পা এক ফুট অন্তর রাখ, দুই হাত একত্রে সোজা ভাবে উঁচু কর। তারপর নিঃশ্বাস লও, পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত শরীরটি সোজা ভাবে রাখিয়া শরীরের উপরি-ভাগ ধীরে ধীরে চিত্রটির মত বাকাইয়া হাতদ্বারা মাটি স্পর্শ কর এবং নিঃশ্বাস ছাড়। আবার পূর্ব্বা-বস্থা গ্রহণ কর।



বার—১০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত।

এই কয়টি ব্যায়াম প্রত্যহ অন্ততঃ আধ ঘণ্টা নিষ্ঠার সহিত করিলে প্রত্যেকেই নীরোগ ও শক্তিশালী হইতে পারে।

ব্যায়ামের সাধারণ নিয়ম

১। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম করা উচিত, অনেক ব্যায়াম-বীর সপ্তাহে একদিন ব্যায়াম বাদ দেন।

২। যে-কোন প্রকার ব্যায়াম করা বা খেলার সময় কথা বলা বা শব্দ করা বা বাজে আলাপ করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

৩। প্রত্যহ প্রাতঃকালে শৌচকর্ম্মাদি করিবার পর খালি পেটে ব্যায়াম করাই প্রকৃষ্ট রীতি। কেহ কেহ অতি সামান্য কিছু খাবার খাইয়া ব্যায়াম করিয়া থাকেন।

৪। ব্যায়াম করিবার সময় মুখ দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস লইতে হয়।

৫। ল্যাঙট, কৌপীন, জাঙ্গিয়া বেশ ভাল করিয়া পরিয়া ব্যায়াম করা উচিত। ল্যাঙট বা কৌপিনাদি না পরিয়া কখনও ব্যায়াম করা উচিত নয়।

৬। ব্যায়ামাদি করিবার সময় অস্বাভাবিক ভাব বর্জ্জনীয়। অনেকে ব্যায়ামের সময় দাত মুখ খিচাইয়া থাকেন। উহাতে শরীরের সুগঠন ও সুডৌল নষ্ট করিয়া ফেলে।

৭। উপযুক্ত পরিশ্রম না হওয়া পর্য্যন্ত এক দমে ব্যায়াম করা উচিত।

৮। সম্ভবপর হইলে আয়নার সামনে ব্যায়াম করিলে উন্নতি দ্রুত হইয়া থাকে।

৯। ব্যায়াম করিবার সময় মন যেন বিক্ষিপ্ত না থাকে। শুধু নিজের শরীরের উপরই মনটিকে নিবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।

১০। সর্ব্বোপরি নৈতিক চরিত্রের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখা উচিত। ইন্দ্রিয় সংযম ও ব্যায়াম পরস্পর সাপেক্ষ ও সহায়ক।